Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার ঊষা

রোলঃ 227021383

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা আক্তার ঊষা

রোলঃ 227021383

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা আক্তার ঊষা, আইডিঃ 227021383 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

খাদিজা আক্তার উষা

(স্বাক্ষর)

খাদিজা আক্তার উষা

আইডিঃ 227021383

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

একজন মানুষ তার নিজেকে চেনা অতীব যরুরি। কিভাবে অপরাধ সংগঠিত হয়? কে কমাণ্ড করে? বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী?

মানুষের আত্মাই দেহের নিয়ন্ত্রক। অন্তর যদি নিজে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে, তবে সারা শরীরের কার্যকলাপও সঠিক থাকবে। পক্ষান্তরে অন্তর যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, তবে শরীরের সব ব্যবস্থাপনাও বিনষ্ট হবে। তাই সবার আগে আত্মাকে ঠিক করা দরকার। আর আত্মার এ পরিশুদ্ধতাই হলো 'তাযকিয়াহ'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, 'নিশ্চয়ই সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজের নফস বা আত্মাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছে। আর সে অকৃতকার্য হয়েছে যে নফসকে কলুষিত করেছে।' (সূরা আশ-শামস: আয়াত: ৯-১০)। আল্লাহপাক আরো বলেন, 'আজ সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকার করতে পারবে না, কেবল যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।' (সুরা শুআরা: আয়াত : ৮৮-৮৯)।

নফস বা আত্মার পরিচয়

নফস শব্দটি আরবি। নফস শব্দের অর্থ প্রাণ, আত্মা। যা সকল প্রাণির দেহেই বিরাজমান। নফস হলো সেই অলৌকিক বস্তু, যা মানুষের দেহে ফুঁ দিয়ে প্রাণের সঞ্চার করা হয়। অথবা নফস সেটাই যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেনঃ- কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মউত। অর্থাৎ প্রত্যেক নফস তথা প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (আলে-ইমরানঃ ১৮৫)

নফস এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে দেখি.......

'জীবন' অর্থে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }آل عمران185 الآية

মানুষ অর্থে-
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (53)

প্রাণ অর্থে-
"والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بالْمعرُوفِ ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ.أخرجه الترمذي(468/4رقم(2169)

প্রবৃত্তি অর্থে-
)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى))[النازعات-40: 41

রূহ ও নফসের মধ্যে পার্থক্য

রূহ ও নফসের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন পার্থক্য নেই। যদিও পারিভাষিক অর্থে পার্থক্য আছে। যেমন প্রাণীকে 'নফস' বলা হয়। কিন্তু 'রূহ' বা আত্মা বলা হয় না। আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে *(আলে ইমরান ১৮৫)*। এতে বুঝা যায় যে, দেহ ও আত্মার মিলিত সত্ত্বাকে 'নফস' বলা হয়। আর শুধুমাত্র আত্মাকে 'রূহ' বলা হয়।

একদা ইহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! তুমি বল, রূহ হ'ল আল্লাহর একটি আদেশ' *(ইসরা ১৭/৮৫)*।
যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, ইসরা ৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। আর নফস সেটাই, যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই যখন রূহ কবয করা হয়, তখন তার চোখ তা দেখতে থাকে' *(মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯ 'জানায়েয' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি দেখনি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের চোখ তাকিয়ে থাকে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, 'তা তো ঐ সময় যখন তার চোখ তার নফসকে দেখতে থাকে' *(মুসলিম হা/৯২১)*

নফসের প্রকারভেদ

নফস মূলত একটি, তবে এর অনেক সিফাত তথা গুণ রয়েছে। ফলে নফসের গুণের হিসেবে এক একটি নাম দেওয়া হয়েছে। একে মুতমাইন্না (مطمئنة) বলা হয়েছে, যেহেতু সে তার রবের ইবাদত ও ভালোবাসায় মুতমাইন্ন তথা প্রশান্ত। আবার একে লাওয়ামাহ(لوامة) বলা হয়েছে, কেননা সে ব্যক্তির বাড়াবাড়িতে তাকে ভর্ৎসনা করে। আবার একে আম্মারাহ(أمّارة) বলা হয়েছে, যেহেতু সে অন্যায় কাজের আদেশ দেয়।

১. নফসে আম্বারাহ (প্রতারক আত্মা) :

অর্থাৎ যে নফস মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক কামনার দিকে আকৃষ্ট করে। এর ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআন আল কারীমে বলেন- ''আমি নিজের নফ্সকে দোষমুক্ত করছি না। নিশ্চয়ই নফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যি আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (ইউসূফঃ ৫৩)

২. নফসে লাওয়ামাহ (অনুশোচনাকারী আত্মা) :

যে নফস অন্যায় করার পর মানুষের হৃদয়ে অনুশোচনার উদ্রেক করে । আবার গুনাহে লিপ্ত হয় আবার লজ্জিত হয়,মোট কথা সে গুনাহ ছাড়তে ও চায় আবার জানায় বা অজানায় গুনাহে লিপ্ত হয়েও পেরেশানীতে থাকে। এ নফস থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্যেও চিকিৎসা করতে হবে। এই নফসের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন- ''আরও শপথ

করি নফসে লাওয়্যামাহর(সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়) ।'' (আল কিয়ামাহঃ ২)

৩. নফসে মুতামায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) :

যে নফস সকল কালিমা থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় মহৎ ভাবনায় পরিতৃপ্ত। তার কোন ভয় ও দুঃশ্চিন্তা থাকেনা। আল্লাহর প্রতি এই নফস রাজি থাকে সকল হালতে আর আল্লাহ্ এইসব নফসের উপর সব সময় রাজি থাকেন। এই প্রকৃতির নফসের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- ''হে নফসে মুত্বমাইন্নাহ(প্রশান্ত মন), তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও রদ্বিয়ান (সন্তুষ্ট) ও মারদ্বিয়্যান (সন্তোষভাজন) হয়ে। অত:পর আমার (নেক) বান্দাদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।''(আল ফজরঃ ২৭-৩০)

বিজ্ঞান ও আত্মা

মানুষের রহস্যময় আত্মা এবং আরও রহস্যময় ও অদৃশ্য মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' সম্পর্কে নানা তথ্য গোটা কুর'আন শরীফে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব তথ্য একত্রিত করা এবং মহান রবকে আরও ভালভাবে জানার জন্য পদ্ধতিগতভাবে চিন্তা করা হয়েছে ধারাবাহিক এ প্রবন্ধে।

মানব-আত্মার গঠন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়- তার সঙ্গে কুর'আনে বর্ণিত 'সামাওয়াত ওয়াল-আরদ' এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'সামাওয়াত ওয়াল-আরদ' এর বাংলা- মহাকাশ ও যমিন।

তাই এখানে সংক্ষেপে মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করা হলো এবং প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতারা চলে এসেছে। কারণ, তারাও এই সুবিশাল, রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে জিন জাতি। বলে রাখা ভালো, কুর'আনে বর্ণিত 'জিন' মানুষের ধারণা অনুযায়ী কোনো ভূত-প্রেত টাইপের বস্তু নয়। বরং মহান আল্লাহর সৃষ্ট আরেক ধরণের প্রাণী যারা মূলত এই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আসমানের 'সামাওয়াত' বা মহাবিশ্বের প্রধান অধিবাসী।

এখানে মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে ফেরেশতাগণের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। কুর'আন থেকে ধারণা করা যায় যে, ফেরেশতাদের সাম্রাজ্য একটি বিশাল সাইবারনেটিক সিস্টেমের মতো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। প্রাসঙ্গিক আয়াত দিয়ে তা আলোচনা করা হবে।

এ প্রবন্ধে নফস্ (আত্মা), রুহ (আত্মা) ও কলব (মন) সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে এ ব্যবস্থাগুলো কাজ করে- তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের নফসের সঙ্গে রুহের পার্থক্য, নফসের বিকশিত হওয়া এবং তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বাস করি- এ বিষয়গুলো জানা খুব জরুরি। যা জগৎ-সংসার, ধর্ম-কর্ম, সৃষ্টি-স্রষ্টা নিয়ে মানুষের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করবে।

পরিশেষে, সৃষ্টিজগতে 'আল্লাহর প্রতিনিধি' হিসেবে মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। মহান প্রভু কুর'আনে বলেছেন-

Are you a Stronger creation or is the Universe? Allah constructed it. [Al Quran79:27]

তোমারাই কি শক্তিশালী সৃষ্টি নাকি মহাবিশ্ব- যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। [আল কুর'আন ৭৯:২৭]

মহা বিস্ময়কর মহাবিশ্বে মানুষ কীভাবে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে ও করবে- সে সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে ধারাবাহিক প্রবন্ধে।

আলোচনায় বিজ্ঞানের সাধারণ ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা দিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা। বাস্তবতা হলো- আমাদের বিশ্বাস মজবুত করার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনই যথেষ্ট।

অধ্যায় ১: আত্মা বা Soul

প্রথমে আত্মা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করব। আশা করা যায়- আত্মা সম্পর্কে জানার মাধ্যমে মহান প্রভুর অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে বোঝা যাবে- যা অদৃশ্য। আমাদের চারপাশে বেশ কিছু 'আত্মার' অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলোকে 'আত্মা' বা **Soul** হিসেবে আমরা সচরাচর চিনতে পারি না। কারণ তার ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে।

চলুন তাহলে চেনার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই দেখি, আত্মা বা **Soul** কী?

১. আত্মা ও ফোর্স ফিল্ড (শক্তি ক্ষেত্র) Soul and Force Field

আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের আত্মা তার চরিত্র, স্বভাব ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে এবং 'মূল জীবিত সত্তা' হিসাবে মানবদেহে টিকে থাকে। আত্মার দেহত্যাগেই মানবদেহের মৃত্যু নিশ্চিত হয়। কিন্তু, মানুষের আত্মাকে সুস্পষ্টভাবে ধরা, দেখা ও বোঝা যায় না!

তাই 'আত্মা' বুঝতে হলে, আত্মার মতো অন্যান্য শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে।

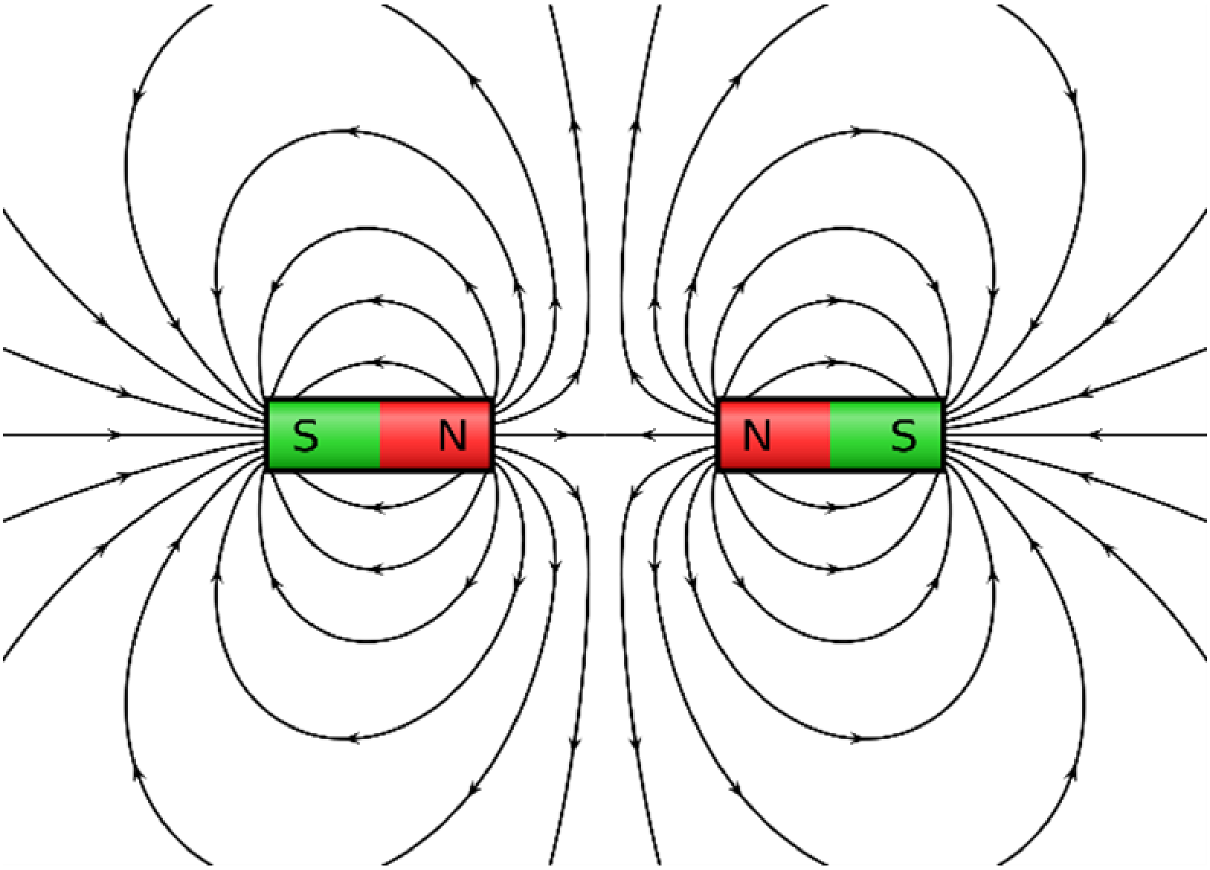
ধর্মীয় কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু হাদিসে দেখা যায়- প্রতিটি বস্তুর (জড় পদার্থের) আত্মা আছে। এ বিষয়টি সত্য বলে আমরা জানতে পেরেছি। বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন ধরণের ফোর্স ফিল্ড (force field) মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে। বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে যান, যখন তাঁরা দেখেন যে- এই সুবিশাল মহাবিশ্ব এতটাই নিখুঁত ও সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ (fine-tuned universe) কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তা সম্ভব না! কে নিয়ন্ত্রণ করছে এসব। এর উত্তর আমরা জানি।

যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আকাশ। দয়াময়- রহমানের সৃষ্টিতে কোনো খুঁত তুমি দেখতে পাবে না! আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো খুঁত পাও কি? তারপর বার বার খুঁজে দেখো, দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে। [৬৭:৩,৪]

He created seven skies in layers. You do not see any discordance in the creation of the All-beneficent. Look again! Do you see any flaw? Look again, once more. Your look will return to you humbled and weary. [67:3,4]

বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত চারটি ফোর্স ফিল্ড খুঁজে পেয়েছেন। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড (আলো), স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ও গ্র্যাভিটি। এই ফোর্স ফিল্ড-গুলো মূলত আত্মা বা 'প্রভুর আদেশ' হিসেবে কাজ করে। যেমন- ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড বা 'বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্র' বা চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field)।

একটি 'ফোর্স ফিল্ড' এবং একটি 'আত্মা' একই জিনিস হতে পারে; অদৃশ্য চৌম্বক ক্ষেত্র জড় পদার্থটিকে বিশেষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেয়। যা ধরা-ছোঁয়া বা দেখা যায় না; আবার তা জীবিত প্রাণীর মতো আচরণ করে! এই ধারণাটি যাচাই করার জন্য আমরা চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে কিছু কথা বলবো।



ছবি ১.১: চৌম্বক ক্ষেত্র

১ (ক). কুর'আনে আত্মা

কুর'আনে, আত্মা (রুহ)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- রুহ হলো আল্লাহর আদেশ।

They ask thee concerning the ruhh (soul). Say: "The ruhh is Command of my Lord." Of knowledge, it is only a little that is communicated to you.

তারা তোমাকে রুহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন- 'রুহ আমার প্রভুর আদেশ' এই জ্ঞানের সামান্যই তোমাকে দেওয়া হয়েছে। [১৭:৮৫]

চলুন দেখি, চৌম্বক ক্ষেত্র কীভাবে 'আদেশ' বা 'Command' হিসেবে কাজ করে।

দৃশ্যপট ১:

আমাদের এই পৃথিবীর একটি বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। যা 'সৌর বায়ুকে' পৃথিবীতে প্রবেশে বাধা দেয়। ছবিতে (১.২) দেখা যাচ্ছে- কীভাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৌর বায়ু প্রতিরোধ করছে। চৌম্বক ক্ষেত্র নির্দেশ দিচ্ছে যে- "খবরদার! পৃথিবীতে ঢুকো না।" সৌর বায়ু পৃথিবীতে ঢুকলে গাছপালা-জীবজন্তু জ্বলে-পুড়ে

ছারখার হয়ে যেতো এবং পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হতো না। যেমন- অন্যান্য কোনও গ্রহে হয়নি।



ছবি ১.২: "পৃথিবীতে ঢুকো না"

পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্র কীভাবে এলো? কীভাবে পৃথিবীতে এত বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হলো ও লাখ লাখ বছর ধরে টিকে রইলো?

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে- ঘূর্ণন, পরিবাহী ও বৈদ্যুতিক পরিবাহী তরল এমন চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি সূর্যের মতো গ্যাসীয় বস্তুর ক্ষেত্রেও আয়নিত গ্যাস চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। যা বিজ্ঞানীদের নিছক ধারণা বা প্রমাণহীন অনুমান। চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য অবশ্যই চৌম্বকশক্তি-সম্পন্ন চুম্বক-দণ্ড প্রয়োজন; যার কোনোটাই পৃথিবী বা সূর্যে নেই। এ দাবিটিও বিজ্ঞানীরাই করছেন।



প্রকৃতপক্ষে, এই 'শক্তি ক্ষেত্র' বা 'ফোর্স ফিল্ড'- 'মহান আল্লাহর আদেশ' হিসাবে বিশাল গ্রহ (জড় পদার্থ) পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে। পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণীজগৎ

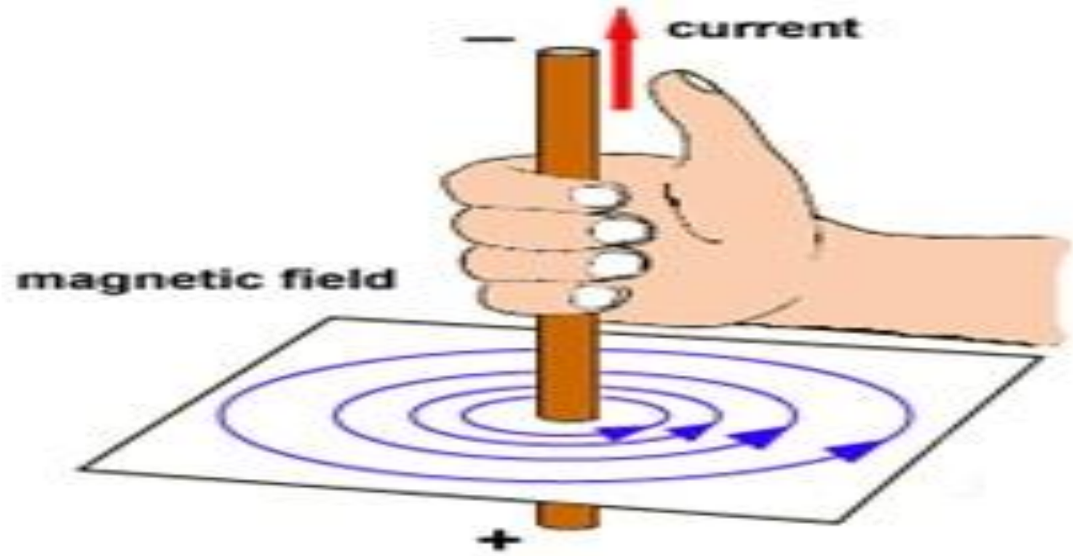
এই দুর্দান্ত ‘চৌম্বক ক্ষেত্র’ ছাড়া কোনোভাবেই এক মুহূর্ত টিকতে পারে না। মাথার ওপর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই ছাদ না থাকলে মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যেত সবকিছু।

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন বিশ্রামের স্থান আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ...

He who made the earth a place of repose for you, and the sky a canopy.. [০২:২২]

দৃশ্যপট ২

মূলত চৌম্বকত্ব- – ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি (electromagnetic force) দিয়ে সৃষ্ট। এটি প্রকৃতির অন্যতম মৌলিক শক্তি। একটি চলমান বৈদ্যুতিক চার্জ এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে লম্বভাবে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। মনে হয় যেন, চৌম্বক ক্ষেত্র ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখছে ও যথাযথভাবে চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্র ধরে রাখার নির্দেশ দিচ্ছে।



চিত্র ১.৩: চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যুৎকে (ইলেক্ট্রন কণাগুলো) ধরে রাখে ও চারদিকে থাকার নির্দেশ দেয়

এই ক্ষেত্রেও, চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড Command বা আদেশের মতো কাজ করছে।

[যখন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা চৌম্বক ক্ষেত্র ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র একে অপরের সঙ্গে ছবির মতো ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে।]

- “The Field is sole governing agency of the particle” – Albert Einstein.

- “ক্ষেত্র হল কণার একমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা”– আলবার্ট আইনস্টাইন

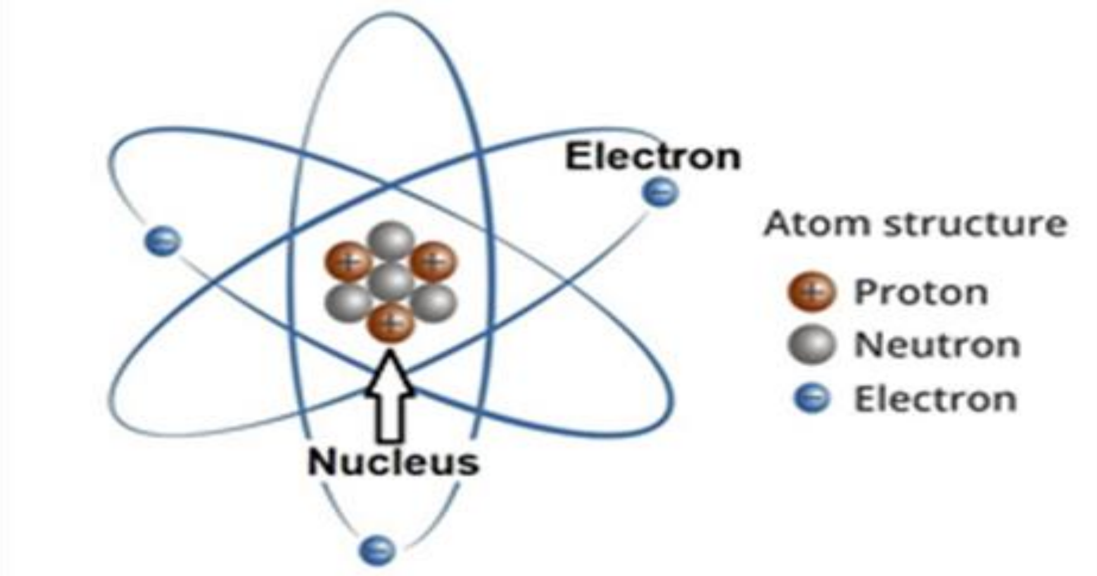
অন্যকথায়, পৃথিবীর এই চৌম্বক ক্ষেত্রটি পৃথিবীর আত্মা- যা পৃথিবীর চারদিকে ছাদের মতো ঘিরে রেখেছে। এটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিকে পৃথিবীতে ঢুকতে দেয় না।



১. খ. আকর্ষণকারী আত্মা Soul which attracts

বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্র শুধু বিকর্ষণই করে না- এই শক্তি আকর্ষণ করে বা ধরে রাখে। পরমাণুর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেই তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

আমরা জানি, প্রোটন কণা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। একটি পরমাণুর শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড প্রোটন কণাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে টেনে ধরে রাখে (ছবি ১.৪)। কিন্তু নিউক্লিয়াস ইলেক্ট্রনকে তার দিকে আকর্ষণ করে না; দূরে সরিয়ে রাখে।



চিত্র ১.৪: পরমাণু

এসব বিশ্লেষণে বোঝা যাচ্ছে, একটি ফোর্স ফিল্ড হলো একটি আত্মা/ Soul বা রুহ্। যা প্রয়োজন অনুযায়ী আকর্ষণ ও বিকষর্ণের কাজ করে থাকে।

এই পর্যায়ে এসে, আমরা বুঝতে পারলাম যে, ফোর্স ফিল্ড ও আত্মা মূলত একই জিনিস; কারণ, তাদের ভূমিকা ও কাজ একই রকম। তারা আল্লাহর দেওয়া সূত্র অনুযায়ী সুনির্ধারিত ‘আদেশ’ মেনে চলে। এই বাস্তবতা আরও যাচাই করা হবে।

২. আত্মার প্রকারভেদ Types of Souls

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনে দুই প্রকার আত্মার কথা বলা হয়েছে:

- ক. রুহ (প্রাথমিক আত্মা)/ Ruhh (Elementary Soul)
- খ. নফস্ (যৌগিক আত্মা)/ Nafs (Composite Soul)

২ক. রুহ روح (মৌলিক আত্মা) Ruhh (Elementary Soul)

রুহ (روح)কে প্রাথমিক বা মৌলিক আত্মা বলা যায়।

আরবি শব্দ 'রুহ'-কে বাংলা ভাষায় 'আত্মা' হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

তিনিই রাতের বেলা তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তিনি জানেন দিনের বেলায় তোমরা যা করো...

It is He who takes your souls by night, and He knows what you do by day... [০৬:৬০]

কিন্তু রাতের বেলা ঘুমের সময় আমাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জীবিত থাকে; তবে আমাদের সচেতনতা কাজ করে না। এই অবস্থাকে আল্লাহ মৃত্যু বলছেন। ঘুমের মধ্যে কেটে যাওয়া ১ মিনিট বা ১০ ঘণ্টা বা ৩০০ বছর বা লক্ষ কোটি বছরের মধ্যে আসলে কোনও পার্থক্য নেই। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে কল্পবিজ্ঞানে মহাকাশের অসীম দূরত্ব ভ্রমণে 'হাইবারনেট'চিন্তার উদ্ভব হয়েছে।

আসহাবে কাহফ বা গুহার অধিবাসীরা ৩০০ বছর ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তাদের বয়স বাড়ে নি, তারা মৃত্যুও বরণ করে নি। অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের ধারণাটিকে স্বীকৃতি দেয় কুর'আন।

ঘুমের সময় মানুষকে চেতনা বা consciousness দানকারী আত্মা চলে যায়; তাকেই মহান রব মৃত্যু বলছেন।

সৃষ্টির প্রথম মানব 'আদম' কিন্তু তখনই চেতনা-প্রাপ্ত হন, যখন আল্লাহ তাঁকে 'রুহ দেন' বা বিশেষ সেই আত্মা দেন। যাতে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন।

- **আমি যখন তাকে সুগঠিত করবো এবং আমার পক্ষ থেকে তাতে রুহ সঞ্চার করে দেবো...**
- **আমি যখন তাকে নিখুঁত ও সুষম করবো এবং তার মধ্যে সঞ্চার করে দেবো রূহ, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদায় অবনত হয়ো** [১৫:২৯; ৩৮:৭২]

মাতৃগর্ভে যখন ধাপে ধাপে শিশুর দেহ গঠন হতে থাকে, তখন সে শিশু নড়াচড়া করে, এপাশ ওপাশ করে, ঘুমায়, খায়, শারীরিক বিকাশ হতে থাকে- শুধু তার সচেতনতা থাকে না।

ভুমিষ্ঠ হবার পর কোনও এক মুহূর্তে শিশুটি সচেতনতা প্রাপ্ত হয় এবং চিৎকার করে কেঁদে ওঠে বা শব্দ করে। যেমন, সচেতনতা লাভ করেছিলেন আদম আ.- রুহ লাভের পর।

একইভাবে, এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল সুদূর অতীতে একবার, যখন কোনও দিন, মাস, আলো- ছিল না! প্রত্যেক বিষয়ের 'রুহ' সংযুক্ত করে দেবার পর দেখা দিয়েছিল নতুন আলো- একটি নতুন মহাবিশ্বে। জেগে উঠেছিল সুপ্ত, ঘুমন্ত মহা-বিশ্বজগত। সুরা কদরে সেই তথ্যই জানানো হয়েছে। (পড়ুন সুরা কদর)

- **পাঠানো হয়েছিল মালাইকা ও 'রুহ' রবের নির্দেশে- প্রত্যেক কাজের জন্য।** {৯৭:৪}
- **...বলো- রুহ হলো তোমার প্রভুর আদেশ।** {১৭:৮৫} (Say, "The soul is the command of my Lord.)

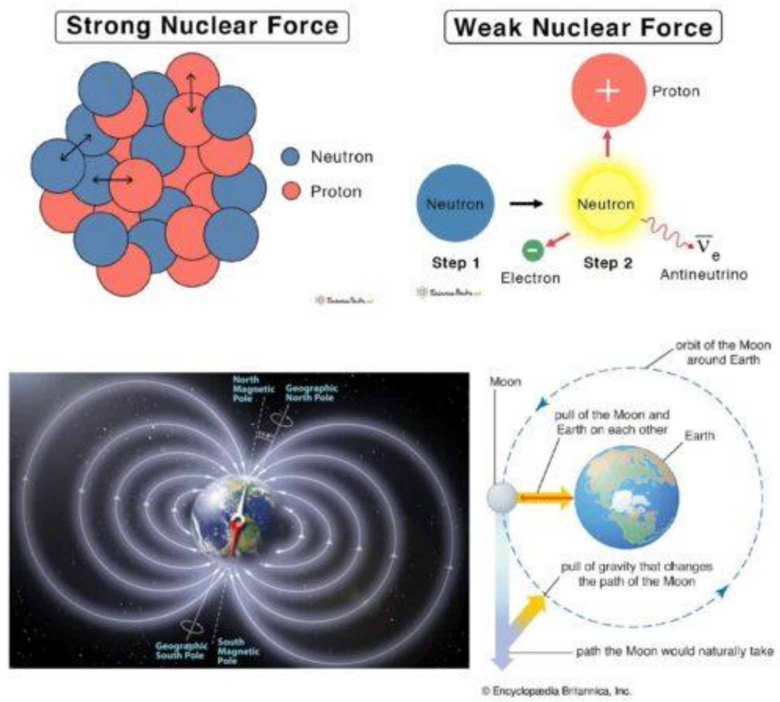
এই রুহ হলো বিশেষ একটি আত্মা বা ফোর্স ফিল্ড- যা মানুষ লাভ করে মহান প্রভুর কাছ থেকে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান এই রুহ আবিষ্কার করতে পারে নি।

মহাজগত বা বিশ্বপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে যে চারটি মৌলিক শক্তি-ক্ষেত্র বা ফোর্স ফিল্ড আবিষ্কার করা গেছে তা হলো- স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড (strong nuclear force field), ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড (আলো), উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ও গ্র্যাভিটি। যা মূলত 'স্রষ্টার আদেশ' এবং এক ধরনের রুহ (Elementary বা মৌলিক আত্মা)। এই চারটি ফোর্স ফিল্ড-এর ওপর মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নাই। তারা সুনির্ধারিত আদেশ অনুসরণ করে চলেছে- ঠিক মানুষের রুহ বা আত্মার মতো। মহান আল্লাহ একটি 'ফোর্স ফিল্ড' ডিজাইন করেছেন,উন্নত করেছেন এবং তা স্থির বা ফিক্সড করে রেখেছেন। বিশাল গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণা- ইলেকট্রন পর্যন্ত সবই নির্ধারিত ফোর্স ফিল্ডের আওতায় কাজ করে।

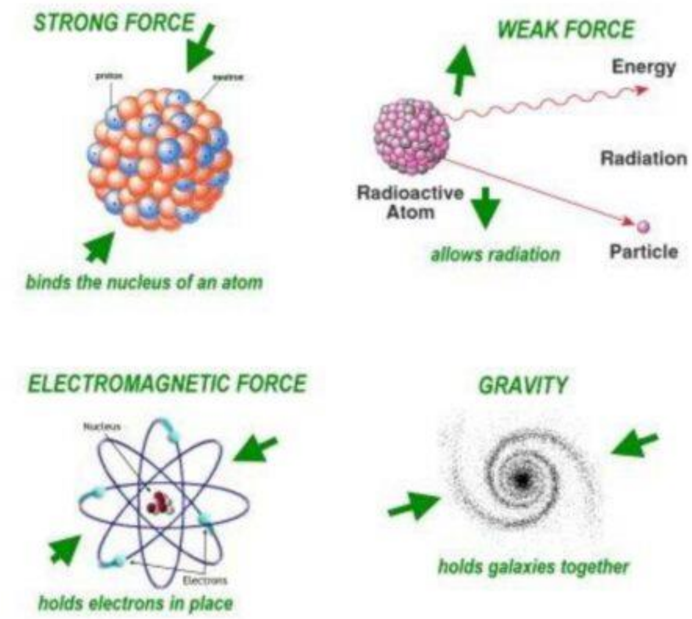
তাই একটি 'পরিকল্পিত ফোর্স ফিল্ড'-কে আমরা একটি রুহ (এলিমেন্টারি বা মৌলিক আত্মা) বলতে পারি; যার সুনির্দিষ্ট কাজ করে এবং এই কাজে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই।

ছবির মাধ্যমে আবিষ্কৃত চারটি 'রুহ' বা প্রভুর নির্দেশকে দেখা যাক।

অতএব, আমরা একটি 'রুহ'কে (একটি প্রাথমিক আত্মা) একটি 'পরিকল্পিত ফোর্স



চিত্র ১.৪.১: স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড (strong nuclear force field), ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড (আলো), উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ও গ্র্যাভিটি



চিত্র ১.৪.২: ৪টি ফোর্স ফিল্ড তৈরি হয়েছে

অতএব, আমরা একটি 'রুহ'কে (একটি প্রাথমিক আত্মা) একটি 'পরিকল্পিত ফোর্স ফিল্ড'হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি- যা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কাজ করেএবং সেসব রুহ দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মাকে সক্রিয় করে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মা হলো 'নফস্'।

২খ. নফস্ نفس (যৌগিক আত্মা)

দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মাকে বলা হয় 'নফস্' (نفس)।

আরবি শব্দ 'নফস্'কেও 'আত্মা' হিসাবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কারণ, রুহ ও নফসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু রুহ ও নফসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে; যা পবিত্র কুর'আনের অসংখ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি নফসকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে.. Every soul will taste death.. [আল কুর'আন ০৩:১৮৫]

আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কোনও নফস্ অন্য নফসের কাজে আসবে না।

And fear a Day when no soul will suffice for another soul.. [আল কুর'আন ০২:৪৮]

সুতরাং তার নফস্ তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। [০৫:৩০]

And his soul permitted to him the murder of his brother, so hekilled him and became among the losers. [০৫:৩০]

নিশ্চয় নফস্ মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, তবে আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া।

Indeed, the soul is a persistent enjoiner of evil, except those upon which my Lord has mercy. [১২:৫৩]

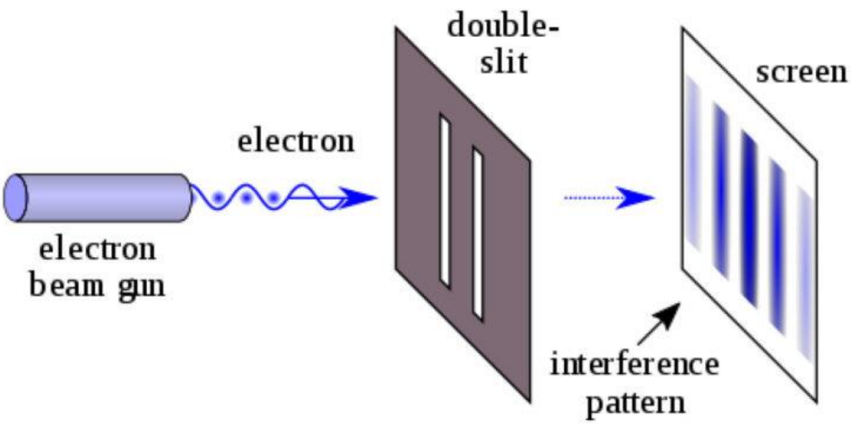
আর যে তার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে আত্মার দাসত্ব ও মন্দ কামনা – বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল।

But as for he who feared the position of his Lord and preventedthe soul from [unlawful] inclination [৭৯:৪০]

এসব এসব আয়াত থেকে দেখা যায়, মানুষের নফস্ তাকে মন্দ কাজে প্রবৃত্ত করে, এই নফস্ বিকশিত হয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এক পর্যায়ে নফস্ মারা যায়। আবার হাশরের ময়দানে এই নফস্ জেগে উঠবে, প্রচণ্ড অসহায় থাকবে, সাহায্যের প্রয়োজন হবে, কিন্তু তা করতে পারবে না।

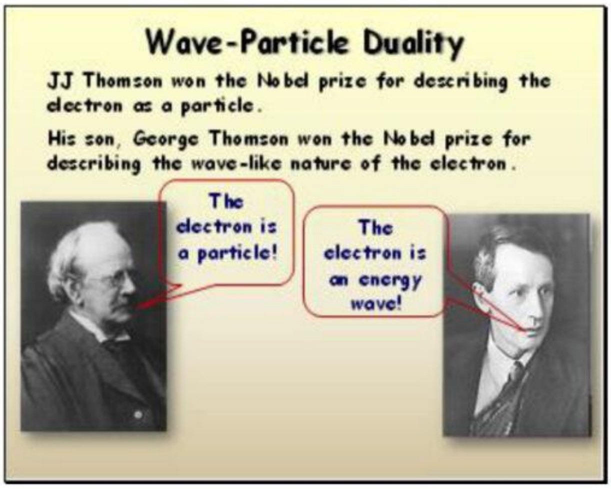
উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই নফস্ হলো 'যৌগিক আত্মা'- দুই বা ততোধিক আত্মার (Elementary force field) সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণে একটি নফস্ তৈরি হতে পারে।

মানুষের মতো প্রাণীজগতের সবার নফস্ রয়েছে। মানুষের চেয়ে বড় আকারের মস্তিষ্ক রয়েছে ডলফিনের। কিন্তু সেই মস্তিষ্ক ডলফিনকে উন্নত প্রাণী বানাতে পারে নি। অন্যদিকে, বিশেষ ধরনের সচেতনতা দেওয়া রুহ (মৌলিক আত্মা) মানুষকে বা মানুষের নফস্‌কে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে চলেছে। আদিম যুগের গুহা-মানব থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানবজাতির ক্রমবিকাশ সে প্রমাণই বহন করে।
অনেক প্রাকৃতিক ব্যবস্থারও এই নফস্ বা আত্মা আছে। যেমন, ক্ষুদ্রতম কণা অ্যাটম বা পরমাণু। একটি পরমাণু ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড (a ruhh), উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড (a ruhh) এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড (a ruhh) দিয়ে তৈরি হয়। এখানে অ্যাটম/ পরমাণু হলো একটি যৌগিক আত্মা- যা ৩টি মৌলিক আত্মা দিয়ে গঠিত। যৌগিক আত্মাকে Composite soul / কম্পোজিট সোল বলা যেতে পারে। পরমাণুর নফস্ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কণাকে ধরে রাখে এবং পরমাণুর দেহ গঠন (atomic structure) করে। এরপরই মূলত পরমাণুটি তার নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আর এই পরমাণুকে ধারণ করেন মহান রব্বুল আলামিন।
মহাকাশ ও যমিনে অণু পরিমাণ বা তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তম কিছুই তার দৃষ্টির অগোচরে নেই; যা আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।
Not an atom's weight escapes your Lord in the earth or in the sky, nor [is there] anything smaller than that nor bigger, but it is in a manifest Book. [১০:৬১]
অতএব, নফস্ হলো দুই বা ততোধিক মৌলিক ফোর্স ফিল্ড-এর সংমিশ্রণ। যা একটি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে; তার রূপ, প্রকৃতি/ চরিত্র নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট কাজ করে।
এই ব্যবস্থা অদৃশ্য পরমাণু থেকে শুরু করে দৃশ্যমান মহাজগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষ ও প্রাণীজগৎও তার ব্যতিক্রম নয়।
২গ. আলো ও সাব-এটমিক কণা (Light and Subatomic Particles)
আলো হলো ইলেক্ট্রো-চৌম্বকীয় শক্তি ক্ষেত্র বা ফোর্স ফিল্ড। আলোতে দুই ধরণের ফোর্স ফিল্ড রয়েছে। যেমন- বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র। সুতরাং, আলোও এক প্রকার নফস্- যা যৌগিক (Composite soul)।
বিজ্ঞান বলছে, মহাবিশ্ব গঠনের শুরুতেই আলো বা 'সাব-এটমিক কণা'(Subatomic Particles) তৈরি হয়ছিল। এই সাব-এটমিক কণাগুলো এক ধরনের নফস



চিত্র ১.৫: ডাবল-স্লিট পরীক্ষা

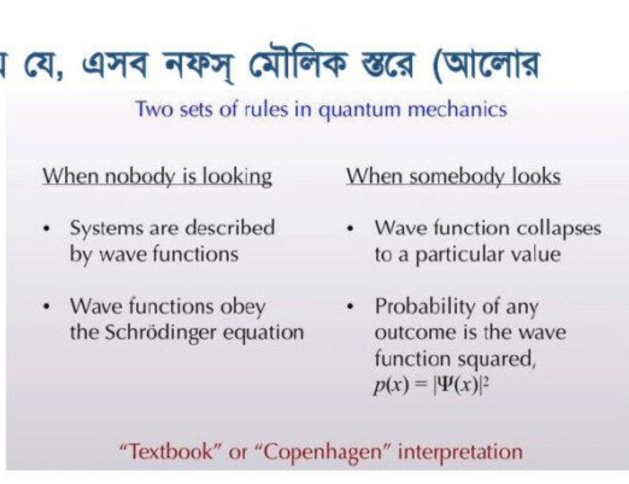
উপরের পরীক্ষাটি বিজ্ঞানের বহুল জনপ্রিয় ডাবল-স্লিট পরীক্ষা। এখানে দেখা যায়, যখন একটি মুক্ত সাব-এটমিক কণা বা ইলেক্ট্রন বিম-গান দিয়ে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন ইলেক্ট্রনগুলো 'একক কণার' মতো আচরণ করে।



আর যখন পর্যবেক্ষণ না করে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তা তরঙ্গের মতো ঢেউ সৃষ্টি করে এগিয়ে যায়।

অর্থাৎ, এই সাব-এটমিক কণাগুলো বুঝতে পারে যে- মানুষ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে (!), তাই কণাটি পর্যবেক্ষণযোগ্য কণা বা 'একক কণা' হিসাবে আচরণ করে।

এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব নফস্ মৌলিক স্তরে (আলোর পর্যায়ে) পূর্ণ সচেতন থাকে!



এই পরীক্ষা ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে জে জে থমসন এবং তার ছেলে জর্জ থমসন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারও জয় করেন।

৩.

পরমাণু ও মহাবিশ্ব

পরমাণু (atom) হলো মহাবিশ্ব গঠনের মৌলিক উপাদান (basic building blocks)। যখন পরমাণু তৈরি হয়ে যায়, তখন পরমাণু (atom) দিয়ে মহাবিশ্বও সৃষ্টি হয়ে যায়। দৃশ্যমান যা কিছু- সবকিছুই এই পরমাণু দিয়ে তৈরি।

একটি পরমাণু তৈরি হয় ফোর্স ফিল্ড (অনেকগুলো রুহ) ও সাব-অ্যাটমিক কণা (অনেকগুলো নফস্) দিয়ে। সুতরাং, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই মহাবিশ্ব বিভিন্ন ধরণের আত্মা (রুহ ও নফস্) দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. নাফসিন-ওয়াহিদাতিন (একটি একক নফস্/ A Nafs Single)

কুর'আনে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তার নিজের নফস্ থেকে একটি বিশাল নফস্ (যৌগিক আত্মা) প্রদান করেছেন। সেই 'প্রদত্ত নফস্' থেকে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। নিচের আয়াতগুলিতে সেই 'প্রদত্ত নফস্কে' ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন*** (একটি একক নফস্ বা a soul single) বলা হয়েছে।

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একক নফস্ থেকে (নাফসিন-ওয়াহিদাতিন) সৃষ্টি করেছেন... [আল কুর'আন ৪:১]

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একক নফস্ থেকে (নাফসিন-ওয়াহিদাতিন); তারপর তোমাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী ও সাময়িক ঠিকানা; যারা বোঝে তাদের জন্য আমরা আমার নিদর্শনগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করি।" [আল কুর'আন ৬:৯৮]

তিনি তোমাকে একটি নফস্ একক (নাফসিন-ওয়াহিদাতিন) থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর অনুরূপ জোড়া তৈরি করেছেন (ডিএনএ ডাবল হেলিক্স); তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন মাতৃগর্ভে- তিনটি অন্ধকার স্তর পার করে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু। সব কর্তৃত্ব শুধুই তাঁর। কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলেছো কোথায়? [৩৯:৬]

হজরত ইসা আ.-এর কাছে নাযিল করা বাইবেলও 'প্রদত্ত নফস্' (নাফসিন-ওয়াহিদাতিন) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

প্রথম দিকে, ঈশ্বর যখন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তখন পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না। সব কিছু ঢেকে রাখা উত্তাল সমুদ্র সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল; এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ঘোরাফেরা করছিল।– জেনেসিস ১ (১-২), পবিত্র বাইবেল, জিএনবি

ঈশ্বরের যে আত্মা, যা জলের উপর ঘুরছিল, তা স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না। তা ছিল একটি আত্মা (নফস্ / যৌগিক আত্মা) যা ঈশ্বর প্রদত্ত। একটি ক্যাথলিক বাইবেলে এটিকে 'ঈশ্বরের নিঃশ্বাস' হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে; কারণ ঈশ্বর একে তার নিজের মধ্যে থেকে (ফুঁকে) ত্যাগ করেছিলেন।

ঈশ্বর, সময়ের শুরুতে স্বর্গ (আকাশ) এবং পৃথিবী (ভূমি) সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী তখনো একটি খালি আবর্জনা এবং গভীর অন্ধকারে ঝুলে ছিল, কিন্তু ইতোমধ্যে এর জলের উপরিভাগ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস আলোড়িত করেছে।

-জেনেসিস ১ (১-২), পবিত্র বাইবেল (নক্স)

ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য তাঁর নিজের শরীর থেকে আত্মা ফুঁকে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুর'আনে এই আত্মাকেই নাফসিন-ওয়াহিদাতিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন ঈশ্বর আদেশ করলেন, "আলো দেখা দিক", তখন প্রদত্ত আত্মায় (নাফসিন-ওয়াহিদাতিন) আলো দেখা দিল:

"...Then God said: Let there be light. And the light began"

"...তখন ঈশ্বর বললেন, আলো হোক। আর আলো দেখা দিলো"

-জেনেসিস ১:৩, বাইবেল (নক্স)

বাইবেল থেকে দেখা গেল, ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন***, যা ছিল একটি যৌগিক আত্মা (নফস্)। যা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলো ও অন্যান্য শক্তির ক্ষেত্র (force fields) তৈরি করেছিল- "আলো তৈরি হোক" এই নির্দেশের আলোকে।

৫. নাফসিন-ওয়াহিদাতিন থেকে সামাওয়াত ওয়াল আরদ গঠন

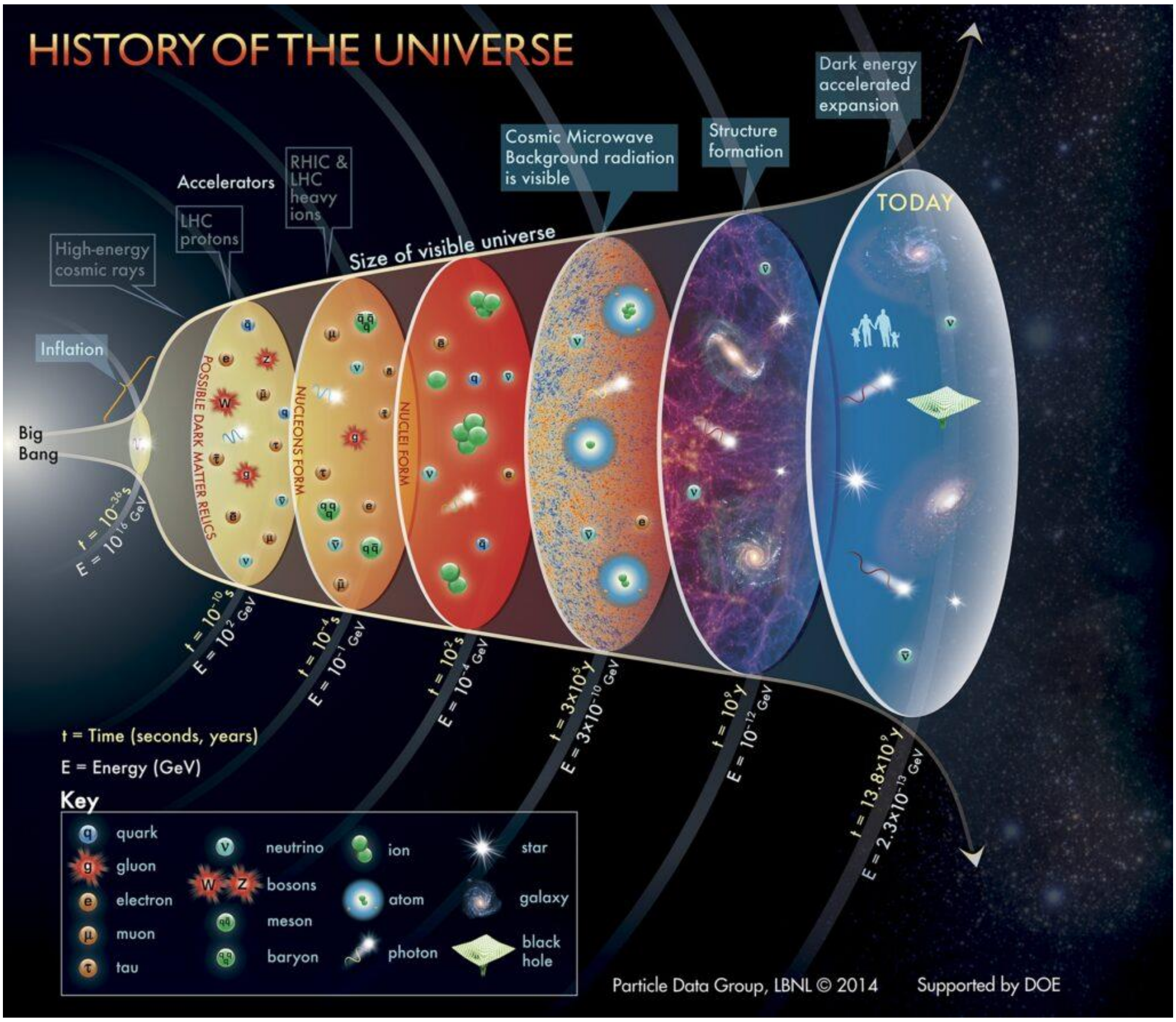
মহান রবের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন*** বা যৌগিক আত্মা (নফস্) ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড (আলো), স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড এবং অজানা অনেক ফোর্স ফিল্ডের উদ্ভব হলো। এই ধারণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত। একটি মৌলিক উপাদান ভাঙতে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এটি একই সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা। মহাকাশে এখনও লক্ষ কোটি নেবুলা বা নক্ষত্রের জন্মস্থান আছে- যেখানে বিস্ফোরণে নির্গত প্রচণ্ড শক্তি বা এনার্জি থেকে একের পর এক নক্ষত্র-রাজি তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, মহান রবের নির্দেশে শক্তিশালী যৌগিক আত্মা (নফস্) ভয়াবহ শক্তি নির্গত করে ফোর্স ফিল্ড ও আলোতে রূপান্তরিত হলো (ভেঙ্গে গেল) এবং বর্তমান মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হলো। একেই বিজ্ঞানের ভাষায় বিগ ব্যাং বলা হয়।

এরপর মহাবিশ্ব আলোর গতিতে প্রসারিত হতে শুরু করলো এবং (বিস্ফোরণে সৃষ্ট) তাপমাত্রাও (লক্ষ কোটি বছর ধরে) কমতে শুরু করল। ফলে, ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন*** থেকে তৈরি হওয়া আলো সাব-অ্যাটমিক কণা (sub atomic particle) গঠন করা শুরু করল।

একটি পরমাণু (atom) আসলে কতটুকু ছোট?

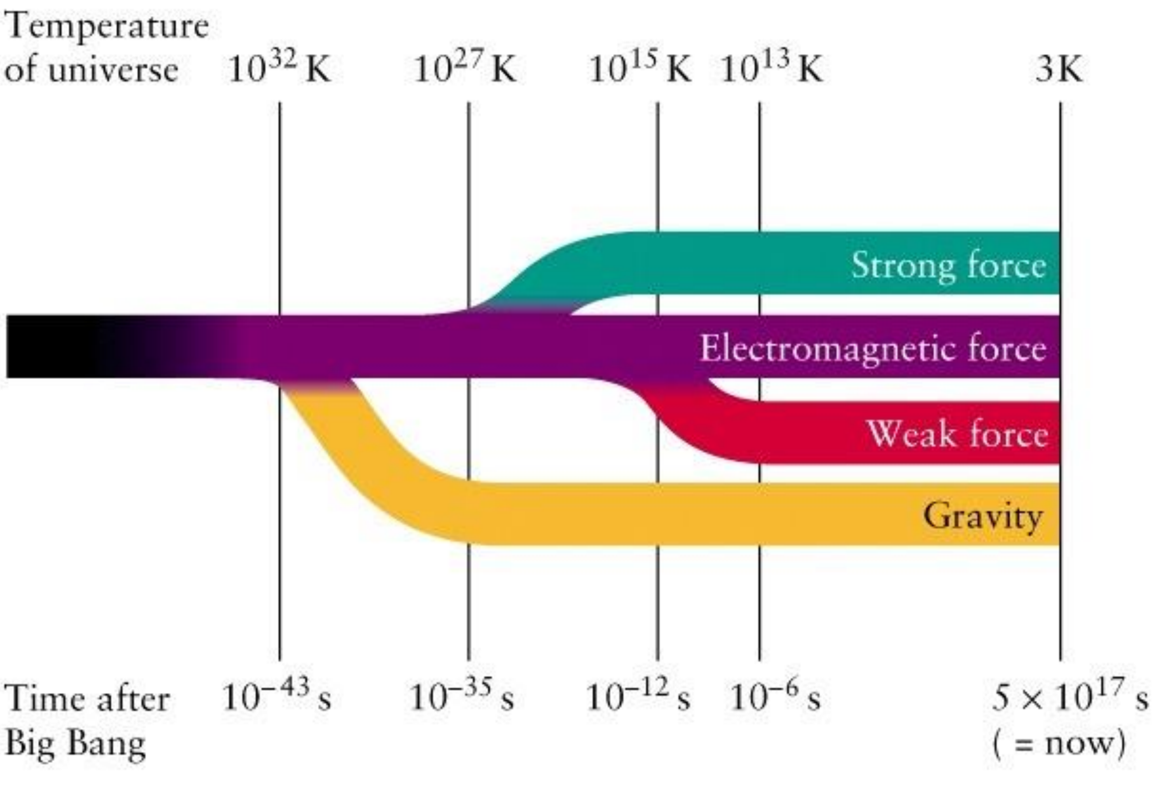
মানুষের মাথার ছোট একটি চুলে ৫ লাখ কার্বন পরমাণু পাশাপাশি থাকে। মানুষের মুখমণ্ডলে আছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন পরমাণু যদি একটি পরমাণু মার্বেলের সমান ধরা হয়, তাহলে আপনার মুখমণ্ডলের আকৃতি কত বড় হবে জানেন? এই পৃথিবীর সমান!



এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পবিত্র বাইবেলের উক্ত আয়াতগুলোতে পানির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে (বিগ ব্যাং এর আগে) পানি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ধারণা করা যায় যে, বিগ ব্যাং এর আগে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরেকটি বিগ ব্যাং ঘটিয়েছিলেন যা এই পানি তৈরি করেছিল। সম্ভবত, অসীম এই সুপার স্পেসে (এই

মহাবিশ্বের বাইরে মহাকাশ) একটি বিশাল জল ভাসমান অবস্থায় ছিল। আমরা জানি- আরেকটি মহাবিশ্ব আছে, যার নাম জান্নাত। মূলত, সেই জান্নাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল পানি। মহাগ্রন্থ কুর'আনে জান্নাতের বর্ণনায় বার বার প্রচুর পানির কথা পাওয়া যায়। যাই হোক, সৃষ্টির আদিতে সেই পানির খুব সামান্য অংশই এই মহাবিশ্বে (সামাওয়াতে) দেওয়া হয়েছিল।

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে যে- এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন***(আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশাল যৌগিক আত্মা) থেকে এবং বিজ্ঞান বলছে যে- বিগ ব্যাং তথা মহাবিশ্ব **গাট ফোর্স** (GUT: Force of Grand Unified Theory)থেকে তৈরি হয়েছে। তাহলে, আমরা খুব সহজেই 'আত্মা' ও 'ফোর্স ফিল্ডকে' (GUT Force)একই জিনিস হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। বস্তুত, এটি একই জিনিসের (আত্মার) দুটি ভিন্ন নাম-মাত্র।

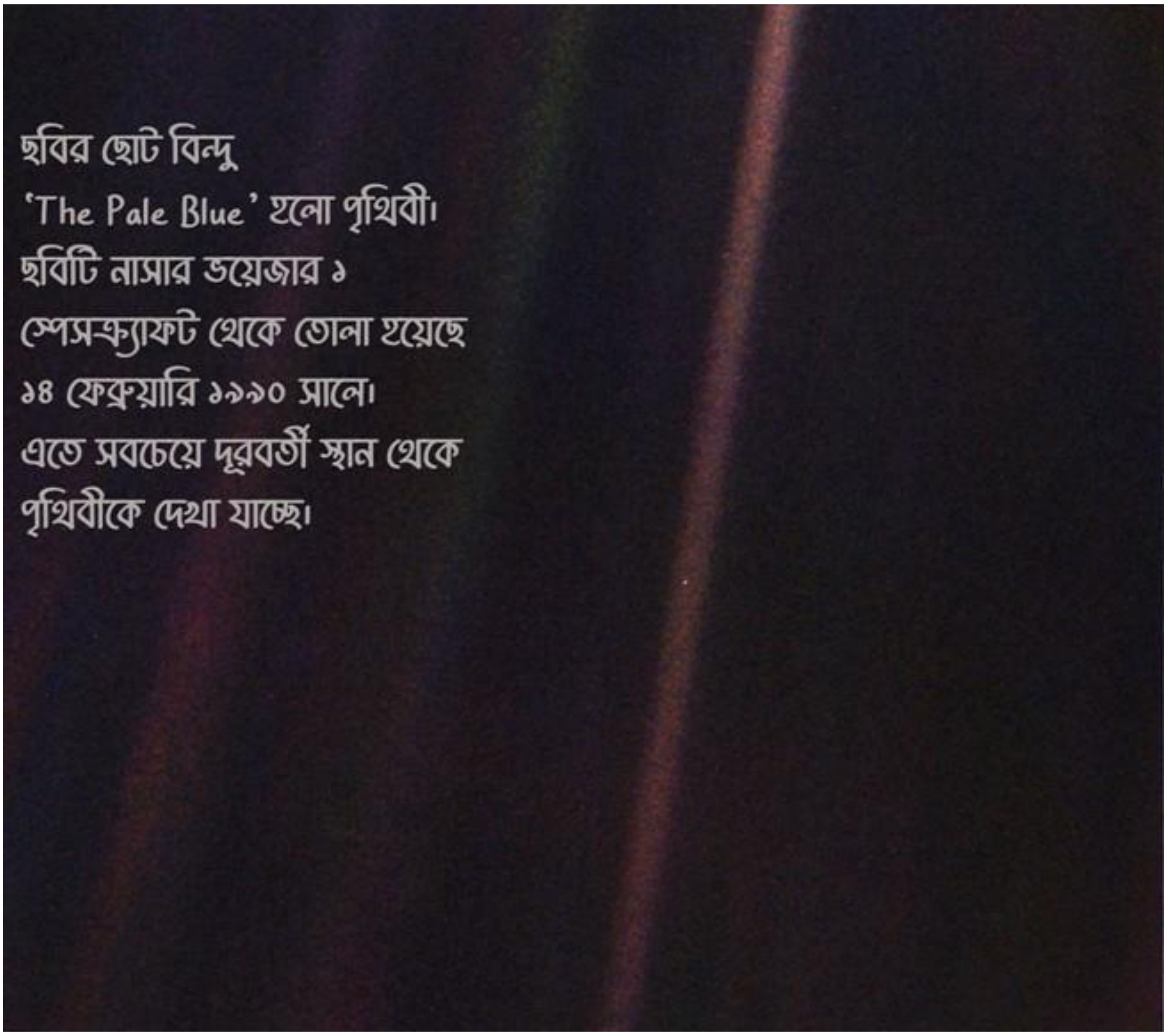


ছবি: গাট ফোর্স (GUT: Force of Grand Unified Theory)

৬. মহাবিশ্ব ও পৃথিবী

বিশাল এই মহাবিশ্ব গঠন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হলো মানুষ। কল্পনার অযোগ্য ক্রমশ বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে প্রায় অদৃশ্য একটি গ্যালাক্সির নাম মিল্কিওয়ে (Milky Way)। সেই গ্যালাক্সির কোনও এক অদৃশ্য কোণায় অবস্থিত আমাদের পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বুকে ভালো-মন্দ কর্মে লিপ্ত মানুষগুলোকেও আল্লাহ তাঁর ***নাফসিন-ওয়াহিদাতিন***

থেকে সৃষ্ট আত্মা এবং বিশেষ রুহ দিয়েছেন। পাশাপাশি এই মানুষকে তিনি খলিফার মর্যাদাও দিয়েছেন।



মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেছেন:

The creation of the Universe and Lands are greater than the creation of mankind, but most of the people do not know. [Al Quran 40:57]

মহাকাশ ও যমিন-সমূহের সৃষ্টি মানবজাতি সৃষ্টির চেয়ে বৃহত্তর বিষয়, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা বোঝে না। [আল কুর'আন ৪০:৫৭]

দৃশ্যমান মহাবিশ্বের তুলনায় আকার–আয়তনে অদৃশ্যের চেয়েও ক্ষুদ্রতম একটি অংশ মানুষ! সৃষ্টির অন্যান্য অংশের মতো মানুষও আত্মা (নফস্) পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে মহান রবের দেওয়া বিশেষ আত্মা বা রুহ পেয়েছে।

এই দুয়ের অভূতপূর্ব সমন্বয়পর্ব ও বিকাশ চলছে পৃথিবীর জীবনে।

অন্তর যেভাবে কলুষিত ও দাগযুক্ত হয়

প্রাণ দেহ থেকে বের করে না ঠিক, কিন্তু আত্মাকে গোপনে মেরে ফেলে। কর্মে অবসাদ নিয়ে আসে। সব কিছুতে শূন্যতা ও একাকিত্ব অনুভব হয়। নেক আমলের নূর চলে যায়।

অন্ধকার স্থান করে নেয় অন্তরে। কোনো কিছুতেই ভালো লাগে না। না ইবাদতের স্বাদ, না কর্মে তৎপরতা। এমন কিছু কাজ আছে, যা বান্দাকে আল্লাহর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

ঈমানে দুর্বলতা চলে আসে। এমনকি জাহান্নামে যাওয়ারও কারণ হতে পারে। সেসব গুনাহের কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস এখানে।

গোপন অপরাধ

গোপন ইবাদত যেমন আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়, তেমনি গোপন অপরাধ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

গোপনে কারো হক নষ্ট করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, গোপনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া— সবই গোপন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। বান্দা গোপনে গুনাহ করতে করতে অন্তর কুলষিত করে ফেলে। ফলে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। হাদিসে এসেছে, বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর সে যখন গুনাহের কাজ পরিহার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়।

সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তায়ালা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে।' (সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪) (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৩৪)

গোপন গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বলেন,

হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বলেন, তারা তোমাদের

ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। (ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)

দৃষ্টি সংযত না রাখা

অন্তরের নূর চলে যাওয়া ও অন্তর কলুষিত হওয়ার একটি কারণ হলো দৃষ্টি অবনত না করা। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে যায়। এমনকি জিনার প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। এ জন্যই নবীজি (সা.) বলেছেন, 'অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীর থেকে একটি তীর।' (মুসনাদে আশ-শিহাব ১/১৯৫)

এই তীরে বিদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে হলে নজর হেফাজত করতে হবে। অন্যথায় অগণিত নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। রাসুল (সা.) উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা দৃষ্টিকে নত করো, নিয়ন্ত্রণ করো এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করো। (তবারানি, হাদিস : ৮০১৮)

পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি

এটিও গোপন গুনাহের একটি ধরন। চোখের খেয়ানতই হলো এই আসক্তির মূল কারণ। আত্মাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে এটি। লাখ লাখ তরুণ-তরুণী এর ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। অনেকে চেষ্টা করেও বের হতে পারছে না। মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এটি গ্রামগঞ্জেও। এর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়াবহ যে দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার পেছনেও এর প্রভাব বিদ্যমান। বিয়ের পরও অনেকে এর আসক্তি থেকে বের হতে পারছে না। ভেবে দেখেছেন, এই পর্নোগ্রাফি কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে? অনেকে অজান্তেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫)

সমাজে অধিক হারে ধর্ষণের জন্য এই পর্নোগ্রাফি দায়ী। অথচ এটি চোখের জিনার অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে এসেছে, নিঃসন্দেহে দুচোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দুকানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া এবং হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-

বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (মুসলিম, হাদিস : ৬৬৪৭)

অসৎ সঙ্গ :

অসৎ লোকের প্রভাব মানুষের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অসৎ লোকদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আপনি দৃঢ়চিত্তে তাদের সঙ্গে থাকুন, যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে অবচেতন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।' (সুরা : কাহাফ, আয়াত : ২৮)

বিলাসিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা :

বিলাসিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অতি ভোগে অন্তর আল্লাহভোলা হয়ে যায়। সীমাতিরিক্ত বিলাসী জীবন মুমিনের অন্তর কলুষিত করে দেয়। ইবাদতের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। মানুষকে চরম হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। তাই অন্তরের শুদ্ধতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিলাসিতা দূর করে অল্পতে তুষ্ট থাকার মনোভাব লালন করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজনমাফিক রিজিক প্রদান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সে-ই সফলকাম হয়েছে।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১৩৮)

ভোজনবিলাস :

স্বাস্থ্যের সুস্থতার জন্য পরিমিত খাবারের বিকল্প নেই। বেশি খাবার শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি অন্তরকেও অসুস্থ করে তোলে। ইবাদত-বন্দেগিতে আলস্য ও অমনোযোগিতা চলে আসে। তাই শারীরিক ও আত্মিক সুস্থতার জন্য খাবার গ্রহণে সতর্কতা জরুরি। তা ছাড়া যারা হরেক রকম বিলাসী খাবারে অভ্যস্ত হয়ে আমলবিমুখ থাকবে, তাদের নিকৃষ্ট লোক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা খাবে রকমারি খাবার, পান করবে রকমারি

পানীয়, পরিধান করবে রকমারি পোশাক এবং তারা আবোলতাবোল বকবে। এরাই হবে আমার উম্মতের নিকৃষ্টতম লোক।' (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা, হাদিস : ৩৬৬৩)

তাই অন্তর ও দেহকে সুস্থ রাখতে অনিয়ন্ত্রিত, বিলাসী ও হারাম খাবার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

মাত্রাতিরিক্ত ঘুম :

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ঘুম অন্যতম একটি নিয়ামত। তবে অসময় ও বেশি ঘুম শারীরিকভাবে যেমন ক্ষতি করে, অন্তরেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে বেশি ঘুম প্রতিবন্ধক হয়। তা ছাড়া বেশি ঘুমে পরোক্ষভাবে শয়তানকেও খুশি করা হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এটা বলে চাপড়ায় যে তোমার সামনে আছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, একটি গিঁট খুলে যায়। অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর নামাজ আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উদ্যম ও আনন্দের। অন্যথায় সে প্রভাত করে অলস ও মনমরা হয়ে। (বুখারি, হাদিস : ১১৪২)

বেশি হাসাহাসি :

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে সৌজন্যমূলক হাসি সওয়াবের কাজ। কথাবার্তায়ও স্বাভাবিক হাসি দোষণীয় নয়। প্রিয় নবী (সা.) সর্বদা সবার সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু বেশি হাসাহাসি করা, অট্টহাসি দৃষ্টিকটু ও নিন্দনীয়। তা ছাড়া এ অভ্যাস হৃদয়কে কঠিন ও নির্জীব করে দেয়। এ জন্য রাসুল (সা.) বেশি হাসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা বেশি পরিমাণে হাসবে না। কেননা বেশি হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে এবং মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দেয়।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৫)

তাই অন্তরকে স্বপ্রাণ ও শুদ্ধ রাখতে হলে বেশি হাসি থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করার তাওফিক দান করুক।

অন্তরের রোগ বৃদ্ধি পায় কীভাবে?

অন্তরের এজাতীয় রোগ ও ব্যাধি কীভাবে বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যখন সে গোনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়, ক্ষমা চায় এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। নতুবা পুনরায় গোনাহ করতে থাকলে সেই কালো দাগ আরও বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুরো অন্তর (কালো দাগে) ছেয়ে যায়। সেটাকেই আল্লাহ তাআলা মরিচা বলে উল্লেখ করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। [সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ১৪] —জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৩৪

মরিচার আস্তর জমে লৌহধাতু যেমন তার স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, মানব হৃদয়ও তেমনি হারাতে থাকে তার স্বভাব শক্তি। ফলে জীবনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হতে থাকে, স্বাভাবিক-শুদ্ধ পথে চলা মন্থর হতে থাকে, হ্রাস পেতে থাকে পাপ প্রতিরোধের কুদরতী ক্ষমতা। আর তখনই মানুষ তার মানবমর্যাদা থেকে নিচে নামতে শুরু করে। সম্ভাবনার সকল দুয়ার থেকে দূরে সরতে থাকে। জীবন পর্যবসিত হয় গ্লানিমাখা ব্যর্থতায়।

এ করুণ বাস্তবতা মানব সমাজে কম তো নয়।

অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থতা দেহেও প্রভাব ফেলে

বাস্তবেই, অন্তরজগতের অসুস্থতা শারীরিক অসুস্থতা থেকে মোটেও কম কিছু নয়। বরং অন্তরের অসুস্থতা অনেকক্ষেত্রে দেহের অসুস্থতা থেকেও বেশি ক্ষতিকর। কারণ, তাতে আখেরাতের ক্ষতি তো আছেই, দুনিয়াতেও আছে ঘৃণা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনাসহ বহুবিধ ক্ষতি ও পেরেশানী। উপরন্তু অন্তরের অসুস্থতা মানবদেহকেও নানাভাবে অসুস্থ করে তোলে। দেহের সুস্থতার ক্ষেত্রে অন্তরের সুস্থতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে— সেকথাও উল্লেখিত হয়েছে একটি হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

জেনে রাখ, নিশ্চয় দেহে একটি পিণ্ড আছে। সেটি যখন ঠিক হয়ে যায়, পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায়। আর যখন সেটি নষ্ট হয়ে যায়, পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেই পিণ্ডটি হল কলব। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৯

রুগ্ন অন্তরের অবস্থা

রুগ্ন দেহের মতো রুগ্ন অন্তরও এক সময় তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাতে পঁচন ধরে। দুর্গন্ধ ছড়ায়। পাশের মানুষজন সেই গন্ধ অনুভব করে। কষ্ট পায়। দেহের বড় একটি রোগ যেমন ক্যান্সার, অন্তরেরও ক্যান্সারতুল্য রোগ হল অহংকার ও হিংসা।

ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীর যন্ত্রণা বর্ণনাতীত। দেহের ক্যান্সার দৃশ্যমান বলে তা মেশিনে ধরা পড়ে। অন্তরের ক্যান্সার অদৃশ্য বলে কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। তবে যন্ত্রণা অনভূত হয় দুটোরই এবং সকল কাজ-কর্মেই সে রোগের ছাপ থাকে।

এমনিভাবে অন্তরের অন্যান্য ব্যাধিগুলোর মধ্যে আছে লোভ, ক্ষোভ, কার্পণ্য, রিয়া বা লোকদেখানো মনোভাব, আত্মমুগ্ধতা, কুধারণা ও পরনিন্দা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও ছোট-বড় আরো অনেক রোগ রয়েছে।

আমাদের উচিত অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এর চিকিৎসা করা। হৃদয় ও অন্তরকে পবিত্র করা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও প্রশান্তির জীবন যাপন করা।

আত্মার পবিত্রতা কি

মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র বা অপবিত্র হয়। মানুষ যদি ঈমান আনে, নেক আমল করে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে, তাহলে তাদের আত্মা পবিত্র থাকে, আর যদি তা না করে, তাহলে তাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। এবং তা নিকৃষ্ট আত্মাতে পরিণত হয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষের কাছে ফেরেশতা আগমন করে। অতএব মুমূর্ষু ব্যক্তি নেককার হলে তারা বলেন, হে পবিত্র আত্মা, পবিত্র দেহ থেকে প্রশংসিত অবস্থায় বের হয়ে এসো এবং আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকে। অতঃপর রুহ বের হয়ে এলে তারা তা নিয়ে আসমানে আরোহণ করেন। এ রুহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সে কে? ফেরেশতারা বলেন, অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মাকে স্বাগতম, যা ছিল পবিত্র দেহে। প্রশংসিত অবস্থায় তুমি প্রবেশ করো। আল্লাহর রহমত ও সুঘ্রাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার রব তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। তাকে অবিরত এ সংবাদ প্রদান করা হয়—ততক্ষণ অবধি, যখন তা মহামহিম আল্লাহ যে আসমানে অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছে যায়।

মুমূর্ষু ব্যক্তি পাপাচারী হলে ফেরেশতা বলেন, হে নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মা, নিন্দিত অবস্থায় বের হয়ে আসো এবং উত্তপ্ত গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের দুঃসংবাদ গ্রহণ করো এবং অনুরূপ বহু বিষাক্ত বস্তুর। রুহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এভাবে আহ্বান জানাতে থাকেন। অতঃপর তাঁরা রুহসহ ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, নিকৃষ্ট দেহের নিকৃষ্ট আত্মার জন্য নেই কোনো সাদর সম্ভাষণ। তুই নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যা। কারণ তোর জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। অতঃপর একে আসমান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা কবরে ফিরে আসে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৬২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মানুষের কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র-অপবিত্র হয়। যাদের আত্মা পবিত্র, পরকালীন যাত্রায় তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, আর

যাদের আত্মা অপবিত্র তাদের পরকালীন যাত্রা অত্যন্ত অপমানজনক হয়, নাউজুবিল্লাহ। কাজেই বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আত্মার পরিচর্যা করা জরুরি। বেশি বেশি নেক আমল আত্মা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে।

পবিত্র আত্মার অধিকারীদের যে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, তার ভাষ্য পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে, 'মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।' (সুরা : ফাজর, আয়াত : ২৭)

আত্মার পবিত্রতার গুরুত্ব

দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। কারণ, অন্তর যদি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে মানবদেহের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও কল্যাণকর হয়। যদি অন্তর অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তাহলে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণসহ তার কাজ-কর্মেও অকল্যাণের কালো ছায়া নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, নিশ্চয় মানবদেহে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যা পরিশুদ্ধ হলে সারা শরীর সুস্থ হয়ে যায়। যখন তা ময়লা হয়ে যায়, তখন সারা শরীর দূষিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে কলব।

মহান আল্লাহতায়ালা কলবকে নির্মল করে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই কলবকে সব ধরনের মলিনতা থেকে হেফাজত রাখতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন : 'সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য রাসুল (সা.) নিয়মিত দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিশুদ্ধ অন্তর কামনা করছি।' (মুসনাদে আহমদ)। রাসুল (সা.) আরও দোয়া করতেন, 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দিন।' (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তর নরম ও প্রশান্ত হয়। এতে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা রা'দের ২৮নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে- 'জেনে রেখ! আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।' আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া কেয়ামতের দিন কোনো কিছুই উপকারে আসবে না। সুতরাং পরকালের ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে। আল্লাহতায়ালা সুরা শুআ'রার ৮৮ ও ৮৯নং আয়াতে এরশাদ করেন- আজ সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকার করতে পারবে না, কেবল যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে, সে ছাড়া।' পরিশুদ্ধ আত্মা হচ্ছে শিরক ও বিদাতসহ অন্যান্য ব্যাধি ও অপছন্দনীয় বস্তু থেকে পবিত্র আত্মা। ফলে মানুষের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত ও ভয় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অসহায় মানুষের কাছাকাছি থাকলে অন্তর নরম হয়। সুযোগ হলে সাধ্যমতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, খাবার খাওয়ানো, খোঁজ-খবর নেওয়া। এতে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে তার অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসুল (সা.) তাকে বললেন, 'যখন তুমি তোমার অন্তর নরম করার ইচ্ছা করবে, তখন এতিমের মাথায় হাত বোলাবে এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।' পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা একাধিক স্থানে কঠোর হৃদয়ের নিন্দা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে- 'দুর্ভোগ কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ। তারা স্পষ্টত বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

আল্লাহতায়ালা সুরা আন-নূরের ৩০নং আয়াতে এরশাদ করেন- 'হে হাবিব! আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের পরিশুদ্ধতার জন্য অধিক কার্যকরী।' গিবত করা, মিথ্যা বলা, অপবাদ দেওয়া, উপহাস করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি জঘন্য কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম পন্থা। কবর জিয়ারত ও মৃত্যুকে স্মরণের মাধ্যমে মানুষের অন্তর আল্লাহমুখী হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আগে আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত করো। কেননা, নিশ্চয় তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্তরের উন্নতি সাধিত করে।'

কুরআনে আত্মার পরিশুদ্ধির মর্ম

সফল হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে'। 'এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে' (শাম্স ৯১/৯-১০)।

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূর্য, চন্দ্র, দিবস, রাত্রি, আকাশ, পৃথিবী ও মানুষসহ আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করার পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার লোকেরাই পৃথিবীতে সফলকাম এবং কলুষিত আত্মার লোকেরা সর্বদা ব্যর্থকাম। তাদের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ যতই পবিত্র হৌক এবং সামাজিক মর্যাদা যতই উন্নত হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে'।[1]

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'তাযকিয়া' (التزكية) অর্থ

التزكية من الشرك وشوائب المعاصي

'শিরক ও পাপের কালিমাসমূহ হ'তে পবিত্র হওয়া'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। মূলতঃ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হ'তে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আর তিনি তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল'। 'এবং এটা তাদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(জুম'আহ ৬২/২-৩)*।

অত্র আয়াতদ্বয়ে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদম সন্তানের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর

সেই আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আর তার ভিত্তিতে যথার্থ ইলম ও আমলের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুদ্ধিতা অর্জন করা।
দ্বিতীয় আয়াতে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে যে, ব্যর্থকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে'। অর্থাৎ যারা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে গিয়ে সাফল্য তালাশ করে, তারা শয়তানের খপপরে পড়ে নিজেকে কলুষিত করে ফেলে। ক্বাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন,

خاب من دس نفسه في المعاصي

'ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়েছে, যার আত্মা পাপে ডুবে গেছে' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ও সে পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮১)*।

আত্মশুদ্ধির উপায় সমূহ :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা :

আল্লাহ মানুষের ও বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনিই আমাদের রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। তিনি যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এ আকাংখা ও ভয় সর্বদা লালন করা। সাথে সাথে প্রতিটি কর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, সর্বদা এ দায়িত্বানুভূতি জাগরুক থাকা। আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(রহমান ৫৫/৪৬)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল' *(নাহল ১৬/১২৮)*। অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

(২) সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলা :

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো’ *(হাশর ৫৯/৭)*। আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর ‘অহি’ ব্যতীত *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। বস্ত্ততঃ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلا بِطَاعَتِهِ ‘হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি ‘অহি’ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহর নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না’।[2]

অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ছালাত-ছিয়াম-হজ্জের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন, যাকাত আদায় ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে মালশুদ্ধি অর্জন ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের মনগড়া ছয় লতীফার যিকর বা ক্বলব ছাফ করার নামে নানাবিধ মা‘রেফতী কলা-কৌশলের মাধ্যমে নয়। এগুলি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের করে শয়তানের আনুগত্যে বন্দী করে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত ঐসব বন্দীশালা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!

যদি মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় না করে, তাহ'লে তার কাছে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ থাকে না। সে হয় স্রেফ প্রবৃত্তিপূজারী একটি বস্তুবাদী জীব মাত্র। আল্লাহ বলেন, فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ 'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় হঠকারী এবং তারা হয় গর্বোদ্ধত' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে' 'এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়' 'জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে'। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রাখে' 'জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

(৩) মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيم 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। সবল শ্রেণী পাপ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে তারা আরও পাপে উৎসাহিত হয়। দুর্বল শ্রেণী লঘু পাপে গুরুদন্ড পায়। আবার অনেক সময় বিনা পাপে দন্ড ভোগ করে। ফলে মন্দ কাজের শাস্তি না পেয়ে সবল শ্রেণী যেমন উদ্ধত হয়। তেমনি বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে দুর্বল শ্রেণী হতাশ হয় এবং প্রায়ই তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে। তাই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেখানে যালেম তার যথাযথ শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে।

কিয়ামতের দিন মন্দ কাজের শাস্তি কিরূপ হবে, সে বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝে দেয়া হবে'।[3]

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[4]

২. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উপরে (মি'রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনু আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম। সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল'।[5] ইনি হলেন বনু খুযা'আর নেতা আমর বিন লুহাই বিন আমের, যিনি প্রথম শাম (সিরিয়া) থেকে

‘হোবল’ মূর্তি কিনে এনে কা‘বা গৃহে স্থাপন করেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদী দ্বীনের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরকের প্রবর্তন করেন।

৩. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে আগুনে পুড়ে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং গাধা যেমন গম পেষার সময় ঘানির চারপাশে ঘুরতে থাকে, অনুরূপভাবে সেও তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় জাহান্নামবাসীরা সেখানে জমা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে? জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম’[6]

৪. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَه ‘যে আলেম মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেয় এবং নিজে সেটা ভুলে যায়, তার তুলনা ঐ প্রদীপের মত যা মানুষকে আলো দেয়, অথচ নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়’।[7] অর্থাৎ আমলহীন আলেম জাহান্নামী হবে।

৫. হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু’জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম (১) একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই-ই করে (এই ভাবে একবার এগাল একবার ওগাল চিরতে থাকে)। আমি বললাম এটা কি?

তারা দু’জন বলল, সামনে চল। (২) অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি একটা ভারি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথর ছুঁড়ে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর পাথরটি দূরে গড়িয়ে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়। ইতিমধ্যে তার মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায়। তখন পুনরায় সে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৩) আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে একটা গর্তের নিকটে এলাম। যা ছিল বড় একটা চুলার মত। যার উপরাংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। যার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা আছে, তারাও উপরের দিকে উঠে আসত এবং তারা গর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার উপক্রম হ’ত। আবার যখন আগুন নীচে নামত, তখন তারাও নীচে নেমে যেত। এর মধ্যে ছিল একদল উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৪) অতঃপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটা রক্তের নদীর কিনারে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ও নদীর কিনারে একজন দাঁড়িয়ে। যার সামনে রয়েছে একটি পাথরের খন্ড। অতঃপর নদীর মধ্যের লোকটি যখনই তীরে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখনই তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার চেহারা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে লোকটি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে সে পূর্বে ছিল। এভাবে যখনই লোকটি তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই কিনারে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি বললাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

... অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা দিল যে, (১) প্রথম ব্যক্তি যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল, ওটা হ’ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হ’ত। এমনকি তা সর্বত্র পৌঁছে যেত। ফলে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (২) যে ব্যক্তির মাথা পাথর ছুঁড়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ’ল সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও সে অনুযায়ী আমল করত না। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (৩)

আগুনের চুলার গর্তে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল যেনাকার। আর (৪) রক্তের নদীর মধ্যে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল সূদখোর'। ... আর আমি হ'লাম জিবরীল এবং ইনি হ'লেন মীকাঈল'।[8]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার অবাধ্য (অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী) সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও নিয়মিত মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[9] 'তাদেরকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করানো হবে'।[10]

৩. ছগীরা গোনাহ সমূহ পরিত্যাগ করা :

ছগীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটা করলে তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কেননা ছগীরা গোনাহ মানুষকে কবীরা গোনাহের দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে, নেশাকর বস্তু বিষয়ে এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিষয়ে এক পা বাড়ালেই তা চুম্বকের মত মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসবের সামান্যতম সুড়সুড়ি পেলেই ওটাকে শয়তানী ধোঁকা মনে করে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে *আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম* বলে ছুটে পালাতে হবে। যুক্তি-তর্কের কবলে পড়লেই শয়তানের ফাঁদে আটকে যেতে হবে। অতএব খালেছ তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ও সকল ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দার কোন অমঙ্গল করেন না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/৩)*।

মনে রাখতে হবে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। বলা হয়ে থাকে, لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار 'ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা ছগীরা থাকে না এবং তওবা করলে আর কবীরা থাকে না'। কবি ইবনুল মু'তায বলেন, لاَ تُحْقِرَنَّ صَغِيْرَةَ + إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى 'ছোট গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। নিশ্চয়ই পাহাড় গড়ে কংকর দ্বারা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبا

‘হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হ’তে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছে’

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ ‘(হে লোকসকল!) তোমরা এমনামন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম’।[12]

৪. সর্বদা কবর ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করা :

(ক) হযরত ওছমান গণী (রাঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ’ল, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে আপনি কাঁদেন না। অথচ এ থেকে কাঁদেন।

জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ- قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صـ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْه ‘নিশ্চয়ই কবর হ’ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ’লে পরবর্তীগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ’লে এর পরেরগুলি অধিকতর কঠিন হবে’। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখিনি’।[13]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ‘তোমরা স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো’।[14]

(গ) আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا- ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ওটা (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে না। আর এটি তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত’। ‘অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের সেখান থেকে উদ্ধার করব এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে রেখে দেব’ *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘জাহান্নামের উপর পুলছিলাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমিই রাসূলগণের মধ্যে প্রথম যিনি তার উম্মতকে নিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম

করবেন। আর সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কথা বলবেন না। তারা কেবল বলবেন, হে আল্লাহ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সা'দান কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের আংটাসমূহ থাকবে। সেগুলি যে কত বড় বড় তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। ঐ আংটাগুলি মানুষকে ধরে নিবে তাদের আমল অনুযায়ী। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে, কেউ শাস্তিতে পিষ্ট হবে। অতঃপর মুক্তি পাবে'।[15] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ জাহান্নামের কিনারায় আসবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। কেউ চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের গতিতে বেরিয়ে যাবে। কেউ ঘোড়দৌড়ের গতিতে, কেউ সাধারণ আরোহীর গতিতে। কেউ পায়ে চলার গতিতে অতিক্রম করবে'।[16]
ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা খারেজী নেতা নাফে' বিন আযরাক্বকে বলেন, আমি ও তুমি অবশ্যই পুলছিরাতে হাযির হব। অতঃপর আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে নাজাত দিবেন। কিন্তু তুমি! আমি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিবেন। কেননা তুমি এটা মিথ্যা মনে করে থাক *(কুরতুবী)*। মু'তা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার আগে কাঁদতে কাঁদতে অত্র আয়াতটি পাঠ করে বলেন, لا أدري أنجو منها أم لا؟ 'আমি জানি না পুলছিরাত থেকে আমি মুক্তি পাব কি-না' *(ইবনু কাছীর)*। অতএব হে মানুষ! মৃত্যু ও জাহান্নামকে ভয় করো।

৫. সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে'। 'সেই মহা দিবসে'? 'যেদিন সকল মানুষ জগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে'? *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)*। এই আয়াত পর্যন্ত এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি ক্রন্দন করতেন। অতঃপর কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্বলিত হাদীছ শুনাতেন। তাছাড়া তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাবধান করতেন *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক'। 'অথচ আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬-১৭)*। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় আনছারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তি। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاس 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হ'ল বিচক্ষণ ব্যক্তি'।[17]এরপরেও সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা তাঁর রহমত ভিন্ন নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না।

৫.আল্লাহর কাছে দোয়া করা :

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে এবং রজনীর প্রথমাংশে। অবশ্যই **নেক আমল পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়**। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এ তাদের জন্য এক উপদেশ।' (সুরা হুদ, আয়াত : ১১৪)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের যা (পাপ) করতে নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর (কবিরা) তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।' -(সুরা : নিসা, আয়াত : ৩১)

শয়তান মানুষের মনে পাপের কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হয়। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (মুদগা) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হলো কলব।' (বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০, হাদিস: ৫০)।

তাই যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে যাওয়া। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে নিজের অন্তরকে গুনাহ থেকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য দোয়া করা। আল্লাহর রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে গুনাহমুক্ত অন্তরের প্রার্থনা করতেন।
হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহ থেকে অন্তর পরিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখতে এই দোয়া পড়তেন-
বাংলা উচ্চারণ :
'আল্লাহুম্মাগসিল কলবি বিমাইস সালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্কি কালবি মিনাল খাতায়া, কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবয়াদা মিনাদ দানাসি, ওয়া বাইদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বায়াদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি।'
অর্থ :
অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন।' (বুখারি : ৬৩৭৭)
অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত দোয়া করতেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা কালবান সা-লিমা', অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিশুদ্ধ অন্তর কামনা করছি।' (মুসনাদে আহমদ : ১৭১১৪)। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও দোয়া করতেন 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব! সাব্বিত কালবি আলা তাআতিকা', অর্থাৎ, 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দিন।' (মুসনাদে
আহমদ : ৯৪২০)

৬.আমলে উদাসীন না হওয়া :

অন্তরের ব্যাধির ব্যাপারে উদাসীন না হওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মধ্যে অবস্থিত, তিনি তা যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।' (মুসলিম : ৬৯২১)

৭.আল্লাহর জিকির করা :

আল্লাহর জিকির ও স্মরণ অন্তর নরম ও প্রশান্ত করে। এতে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হয়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'জেনে রেখ! আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।' (সুরা রাদ : ২৮)

উপরোক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করলে মুমিনগণ তাদের অন্তরজগতকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

নফসের পরিশুদ্ধি জীবন-সফলতার মানদণ্ড

একজন মানুষের দুনিয়াবী জীবনের কীর্তি ও সৌন্দর্য এবং পরকালীন জীবনের স্থায়ী সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে তার নফসের। নফসের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা, নির্মলতা ও কলুষতা এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতা— প্রতিনিয়তই প্রকাশ পেতে থাকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। জীবনের এ পদক্ষেপগুলোই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় হয়ত সফলতার উচ্চ শিখরে কিংবা ব্যর্থতার গভীর গিরিখাদে। তাই কুরআন মাজীদ খুব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এ নিগূঢ় রহস্য। ইরশাদ করেছে—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। —সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

নফসকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হল, সব ধরনের পাপাচার ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা। পাপচিন্তা, পাপ-ইচ্ছা ও পাপাচারী মানসিকতা থেকে রক্ষা করা। প্রবৃত্তি ও রিপুশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। মনের সকল চাহিদা ও ইচ্ছাকে আকল ও বিবেকের অনুগামী করা। এরপর আকল ও বিবেককে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও বিধানের অনুগত করা।

নফসকে বিনষ্ট করার অর্থ হল, বিভিন্ন প্রকারের গোনাহ ও মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে নিজের চিন্তা, কর্ম ও মন-মানসিকতাকে পাপাচ্ছন্ন করে ফেলা। মনের সকল ইচ্ছা ও চাহিদাকে অনুসরণ করে করে প্রবৃত্তি-রিপুকে শক্তিশালী করা এবং আকল ও বিবেককে রিপুর অনুগামী করা। এভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান থেকে সরে গিয়ে

নিজের কামনা ও বাসনার অনুগত হওয়া। (দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৮১৬; রূহুল মাআনী ১৫/১৬৫; তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৭৯৩

স্বীয় নাফসের সাথে মুসলিম বান্দার আদবসমূহ

মুসলিম ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সফলতা নির্ভর করে তার 'নাফস' তথা স্বীয় মনকে সংশোধন, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার পরিধির উপর; যেমনিভাবে তার জীবনের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয় তার মনের ভ্রষ্টতা, নিষ্ক্রিয়তা, কলুষতা, অবিত্রতা ও অশুদ্ধতার কারণে; আর এর পিছনে দলীল বা যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

"সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।"[1] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٤٠ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٤١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٤٢ ﴾ [الاعراف: ٤٠، ٤٢]

"নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[2] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر: ١، ٣]

"সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিপতিত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের এবং উপদেশ দিয়েছে ধৈর্যের।"[3] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى . قَالُوا : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » . (رواه البخاري).

“আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে, সে ব্যতীত; তারা প্রশ্ন করল: হে আল্লাহ রাসূল! কে অস্বীকার করবে? জবাবে তিনি বললেন: যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই মূলত অস্বীকারকারী।”[4] তিনি আরও বলেন:

« كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا » . (رواه مسلم).

“প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়; তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।”[5]

অনুরূপভাবে মুসলিম ব্যক্তি এটাও বিশ্বাস করে যে, যার উপর ভিত্তি করে আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে, তা হলো ঈমানের সৌন্দর্য ও সৎকাজ; আর যার কারণে আত্মা কলুষিত, অপবিত্র ও ধ্বংস হবে, তা হলো কুফরী ও অবাধ্যতার মত খারাপ কাজ; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ

“আর আপনি সালাত কায়েম করুন দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়।”[6] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

“বরং তারা যা অর্জন করেছে, তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।”[7] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذنباً كَانَ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلقَ قَلْبَهُ » . (رواه النسائي و الترمذي و أحمد).

“নিশ্চয় মুমিন বান্দা যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরের মধ্যে তা একটি কালো দাগ সৃষ্টি করে; তারপর যদি সে তাওবা করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়, তাহলে তার অন্তরকে চকচকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়; আর যদি গুনাহর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে (অন্তরের মধ্যে) কালো দাগের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলবে।”[8] আর এটাই হলো অন্তরে মরিচা বা জঙ্ ধরা, যা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

“কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে।”[9] তিনি আরও বলেন:

« اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » . (رواه أحمد و الترمذي و الحاكم).

“তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর; আর অসৎকাজ করলে তার পরপরই সৎকাজ কর, তাহলে তা মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর।”[10]এ জন্য মুসলিম ব্যক্তি সার্বক্ষণিক কাজ করবে তার ‘নাফস’ তথা আত্মার সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণে জন্য; কারণ, ঐ ব্যক্তির আত্মাই উত্তম, যে আদব রক্ষা করে চলে; সুতরাং সে তার নাফসের জন্য এমন কতগুলো আদব রক্ষা করবে, যা তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তার ময়লাসমূহকে দূর করে তাকে পবিত্র করবে; অনুরূপভাবে তাকে দূরে রাখবে খারাপ আকিদা-বিশ্বাস এবং মন্দ কথা ও কাজের মত এমন সব বিষয় থেকে, যা তাকে কলুষিত ও নষ্ট করে দেয়; আর সে তার উন্নতির জন্য রাতদিন চেষ্টা-সাধনা করবে এবং প্রতি মুহূর্তে আত্মসমালোচনা করবে; সে তাকে ভালোকাজে পরিচালিত করবে এবং তাকে (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) আনুগত্য করতে বাধ্য করবে; ঠিক অনুরূপভাবে সে তাকে দূরে রাখবে যাতীয় খারাপ ও মন্দ থেকে; আর তাকে সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহের অনুসরণ করবে:

>

[1] সূরা আশ-শামছ, আয়াত: ৯ - ১০

[2] সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৪০ - ৪২

[3] সূরা আল-আসর, আয়াত: ১ - ৩

[4] বুখারী, হাদিস নং- ৬৮৫১

[5] মুসলিম, হাদিস নং- ৫৫৬

[6] সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪

[7] সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ১৪

[8] নাসায়ী ও তিরমিযী এবং হাদিসটি ‘হাসান সহীহ; আর আহমাদ রহ. হাদিসটি প্রায় একই রকম অর্থে কিছু শাব্দিক হেরফেরসহ হাদিসটি তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং- ৭৯৫২

[9] সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, আয়াত: ১৪

[10] আহমাদ, তিরমিযী ও হাকেম।

(ক) তাওবা (التوبة):

তাওবার উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার অপরাধ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, পূর্বের কৃত প্রত্যেকটি গুনাহ’র জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যৎ জীবনে পুনরায় সেসব গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ﴾ [التحريم: ٨]

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর- বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।”[1] তিনি আরও বলেন:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[2] আর আল্লাহ তা‘আলা শু‘আইব আ. এর বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন:

وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٞ وَدُودٞ

“আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে আস; আমার রব তো পরম দয়ালু, অতি স্নেণহময় ।”[3] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ » . (رواه مسلم).

“হে মানবগোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর; কারণ, আমি তাঁর কাছে দিনে একশত বার তাওবা করি।”[4] তিনি আরও বলেন:

« مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » . (رواه مسلم).

“যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে, তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন।”[5] তিনি আরও বলেন:

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » . (رواه مسلم).

“আল্লাহ তা‘আলা পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) প্রত্যেক রাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আবার তিনি দিনের বেলায় ক্ষমার হাত প্রসারিত করবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে।”[6] তিনি আরও বলেন:

« لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ، ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى كُنْتُ فِيهِ ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ » . (رواه مسلم).

“আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে তার বাহন তথা উটসহ মরুভুমিতে অবস্থান করে, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর জেগে উঠে দেখে সেই উটটি চলে গেছে; অতঃপর সে তাকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে যায়; অতঃপর সে বলে: আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে ফিরে যাব, অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকব। অতঃপর সে মরে যাওয়ার জন্য তার বাহুর উপর মাথা রাখল; অতঃপর সে জেগে উঠে দেখল, তার নিকটেই খাদ্য ও পানীয়সহ তার উটটি অবস্থান করছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার উট ও রসদপত্র ফিরে পেয়ে যেমন আনন্দিত হল, আল্লাহ তা‘আলা মুমিন বান্দার তাওবায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হন।”[7] আরও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশ্তাগণ আদম আ. কে তাঁর তাওবার কারণে অভিনন্দন জানিয়েছে, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তাওবা কবুল করেছেন।[8] তিনি আরও বলেন:

« يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقْتلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا في سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ » . (رواه البخاري).

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এমন দুই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে।”[9] আরও বর্ণিত

আছে যে, ফেরেশ্তাগণ আদম আ. কে তাঁর তাওবার কারণে অভিনন্দন জানিয়েছে, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তাওবা কবুল করেছেন।[10]

>

[1] সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮

[2] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১

[3] সূরা হুদ, আয়াত: ৯০

[4] মুসলিম, হাদিস নং- ৭০৩৪

[5] মুসলিম, হাদিস নং- ৭০৩৬

[6] মুসলিম, হাদিস নং- ৭১৬৫

[7] মুসলিম, হাদিস নং- ৭১৩১

[8] আল-গাযালী, ‘এহইয়াউ ‘উলুমিদ্ দীন’ ।

[9] বুখারী, হাদিস নং- ২৬৭১

[10] আল-গাযালী, ‘এহইয়াউ ‘উলুমিদ্ দীন’ ।

(খ) মুরাকাবা (المراقبة):

আর ‘মুরাকাবা’ হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক তার ‘নাফস’কে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা’র পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাওয়া এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সেভাবে নিয়োজিত রাখা, এমনকি তার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত হওয়া এমনভাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, তিনি তার গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তার কর্মকাণ্ডসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন, তাকে তত্ত্বধান করেন এবং প্রত্যেকটি ‘নাফস’ যা অর্জন করে তিনি তা নিবিড়ভাবে দেখাশুনা করেন; আর এর দ্বারা তার আত্মা

পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তা‘আলার পর্যবেক্ষণের আওতায় চলে যাবে, তাঁর স্মরণে সে আনন্দ অনুভব করবে, তাঁর আনুগত্য করতে মজা পাবে, তাঁর সান্নিধ্য পেতে উৎসাহিতবোধ করবে, তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে এবং তিনি ভিন্ন অন্যকে পরিহার করবে।

আর এটাই হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে উল্লেখিত নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করার অর্থ; তিনি বলেন:

وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ

“তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।”[1] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ

“আর যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ কাছে সমর্পণ করে, সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মজবুত হাতল।”[2] আর এটাই হলো ‘মুরাকাবা’-এর আসল বিষয়, যে দিকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর মধ্যে আহ্বান করেছেন, তিনি বলেন:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ

“আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর।”[3] তিনি আরও বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।”[4] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ ﴾ [يونس: ٦١]

“আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি-- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।”[5] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ » . (متفق عليه).

“তুমি আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদত করবে এমনভাবে, মনে হয় যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে মনে রাখবে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।”[6]

আর এটা এমন এক বিষয়, যাতে অভ্যস্ত হয়েছেন এ উম্মতের প্রথম দিকের সৎকর্মশীল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা এ বিষয়টিকে নিজেদের জীবনের ব্রত (লক্ষ্য) হিসেবে গ্রহণ

করেছেন, এমনকি তাঁদের পূর্ণ একীন বা আস্থা অর্জিত হয়েছে এবং তাঁরা আল্লহর নিকটতম বান্দাদের মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন; আর এখানে তাঁদের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো, যা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে:

১. জুনাইদ রহ. কে জিজ্ঞাস করা হলো: দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার জন্য কিসের সাহায্য নেয়া যেতে পারে? জবাবে তিনি বললেন: তোমার এ জ্ঞান দ্বারাই তা সম্ভব হবে যে, কোনো বস্তুর দিকে তোমার নজর যওয়ার চেয়ে তোমার দিকে দর্শক আল্লাহর নজর বা দৃষ্টি অনেক বেশি দ্রুতগামী।[7]

২. সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন: তোমার উচিৎ হবে এমন সত্তাকে ভয় করা, যাঁর কাছে তোমার কোনো কিছুই গোপন থাকে না; তোমার কর্তব্য হলো এমন সত্তার নিকট কোনো কিছুর আশা করা, যিনি তা পুরণ করার ক্ষমতা রাখেন এবং তোমার উচিৎ হবে এমন এক সত্তার ব্যাপারে সাবধান হওয়া, যিনি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।[8]

৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে অমুক! তুমি আল্লাহকে ভয় কর; তখন লোকটি তাঁকে 'মুরাকাবা' তথা আল্লার ভয় সম্পকে জিজ্ঞাসা করলেন; জবাবে তিনি তাকে বললেন: তুমি সব সময় এমনভাবে জীবনযাপন করবে, মনে হয় যেন তুমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছো।[9]

৪. আবদুল্লাহ ইবন দিনার বলেন: আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং পথিমধ্যে আমরা বিশ্রামের জন্য অবস্থান করলাম, অতঃপর পাহাড় থেকে এক রাখাল আমাদের নিকট নেমে আসল; অতঃপর ওমর রা. তাকে লক্ষ্য করে বললেন: হে রাখাল! এ ছাগলের পাল থেকে একটি ছাগল আমাদের কাছে বিক্রি কর; তখন রাখাল বলল যে, সে গোলাম মাত্র (ছাগলের মালিক নয়); তারপর ওমর রা. তাকে বলল: তুমি তোমার মালিককে বলবে ছাগলটি বাঘে খেয়েছে; তখন গোলাম বলল: আল্লাহ কোথায় থাকবেন? এ কথা শুনে ওমর রা. কেঁদে ফেললেন এবং পরের দিন রাখালটির মালিকের নিকট গেলেন এবং তার কাছ থেকে তাকে (গোলামটিকে) ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[10]

৫. কোনো এক সৎব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, যারা মল্লযুদ্ধ বা তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, আর একজন তাদের থেকে দূরে বসে তা উপভোগ করছে; তারপর তিনি তার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে বললেন: আমি (তোমার কাছে) আল্লাহর স্মরণ প্রত্যাশা করি; তখন সে বলল: তুমি কি একা? জবাবে তিনি বললেন: আমার

সাথে আমার রব এবং আমার দুই ফেরেশ্তা আছেন; এবার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে অগ্রগামী? জবাবে সে বলল: যাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন; এবার সে তাকে জিজ্ঞাসা করল: রাস্তা কোথায়, অর্থাৎ কোথায় যাবেন? জবাবে তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন।[11]

৬. বর্ণিত আছে যে, যুলায়খা যখন ইউসূফ আ. কে নির্জনে একাকী পেল, তখন দাঁড়িয়ে গেল এবং তার (ঘরে সংরক্ষিত) মূর্তির চেহারা ঢেকে দিল; তারপর ইউসূফ আ. বললেন: তোমার কী হয়েছে? তুমি কি একটি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের দেখে ফেলবে বলে লজ্জা পাচ্ছো? তাহলে আমি কি মহাপরাক্রমশালী বাদশার পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনকে লজ্জা পাবো না? [12]

আবার কেউ কেই আবৃত্তি করেন:

ُإِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ: عَلَيَّ رَقِيب

(যখনই তুমি একদিন সময় অতিবাহিত করবে, তখন তুমি বলবে না

আমি সময় অতিবাহিত করে ফেললাম, বরং তুমি বল: আমার উপর রয়েছেন এক পর্যবেক্ষ- প্রহরী)।

ُوَ لا تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفَلُ سَاعَةً وَ لا أَنَّ مَا تُخْفي عَلَيْهِ يَغِيب

(আর তুমি আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল বা অসতর্ক মনে করো না,

আর তুমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছুই গোপন করবে, তাঁর কাছে তা গোপনও থাকবে না)।

ُألم تر أن اليومَ أسرعُ ذاهبٍ و أن غداً للناظرين قريب

(তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আজকের দিনটি কত দ্রুত চলে যাচ্ছে,আর আগামী দিনটি দর্শকদের জন্য খুবই নিকটবর্তী) ? [13]

>

[1] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫

[2] সূরা লুকমান, আয়াত: ২২

[3] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৫

[4] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১

[5] সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১

[6] বুখারী ও মুসলিম।

[7] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১১৯

[8] প্রাগুক্ত

[9] প্রাগুক্ত

[10] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[11] প্রাগুক্ত

[12] প্রাগুক্ত

[13] প্রাগুক্ত

(গ) মুহাসাবা (المحاسبة):

আর 'মুহাসাবা' হলো যখন মুসলিম ব্যক্তি এ জীবনে রাতদিন এমনভাবে আমল করে, যা তাকে পরকালে সৌভাগ্যবান করবে, আখিরাতে সম্মান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে সম্ভব করে তুলবে এবং দুনিয়া হবে তার মৌসুম বা সময়কাল, তখন তার উচিত হলো তার উপর আবশ্যকীয় ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলোর প্রতি এমনভাবে নজর দেওয়া, যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী তার মূলধনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে; আর নফল বিষয়গুলোর প্রতি এমনভাবে নজর দেওয়া, যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী মূলধনের উপর অতিরিক্ত লাভের দিকে দৃষ্টি রাখে; আর অবাধ্যতা ও অপরাধের দিকে দৃষ্টি রাখবে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার মত করে; অতঃপর প্রত্যেক দিনের শেষে নিরিবিলে নির্জনে একটি সময় করে তাতে তার সেদিনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করবে; তারপর সে যদি দেখে ফরযসমূহ পালনে কোনো ঘাটতি বা ত্রুটি হয়েছে,

তাহলে সে স্বীয় নাফসকে তিরস্কার করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করার জন্য পদক্ষেপ নেবে। সুতরাং তা যদি কাযা আদায় করার মত কোনো বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে কাযা করে নেবে; আর কাযা আদায় করার মত বিষয় না হলে বেশি করে নফল আদায় করার মাধ্যমে তার ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করবে; আর যদি সে নফলের ব্যাপারে ঘাটতি দেখে, তাহলে ঘাটতি পূরণ করে নেবে এবং তা সংশোধন করবে। আর যদি সে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার কারণে কোনো ক্ষতির বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অনুতপ্ত হবে, তাওবা করবে এবং এমন ভালো কাজ করবে, যাকে সে তার অন্যায়ের পরিপূরক মনে করবে।

আর এটাই হলো 'মুহাসাবা' তথা আত্মসমালোচনার মূল উদ্দেশ্য; আর আত্মসমালোচনা হলো 'নাফস' তথা আত্মাকে সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার অন্যতম একটি পদ্ধতি; আর তার কিছু দলীল ও দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[1] সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ -এর মধ্যে ব্যক্তিকে প্রতিক্ষিত আগামী দিন তথা পরকালোর জন্য কী আমল করা হয়েছে, সে বিষয়ে আত্মসমালোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে আস, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[2]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » . (رواه مسلم).

"(কখনও কখনও) আমার অন্তরের উপর পর্দা ফেলা হয়; আর আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[3]

৪. ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

« حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا » .

"তোমরা হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই তোমাদের নিজেদের হিসাব নিজেরা নিয়ে নাও।"[4] আর যখন রাতের আগমন ঘটত, তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দোর্রা বা

লাঠি দিয়ে তাঁর দু'পায়ে পিটাতেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করে বলতেন: তুমি আজকে কী কাজ করেছ?[5]

৫. আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে যখন তাঁর বাগান তাঁর সালাত আদায় করার বিষয়টিকে ভুলিয়ে রাখল, তখন তিনি বাগানের অংশবিশেষ আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সাদকা করে দিলেন; সুতরাং তিনি এ কাজটি করেছিলেন শুধু তাঁর আত্মসমালোচনার কারণেই এবং নিজকে তিরস্কার স্বরূপ ও আত্ম-সংশোধনের জন্য।[6]

৬. আহনাফ ইবন কায়েস সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি চেরাগের নিকট আসতেন, তারপর তিনি তাঁর আঙুল চেরাগের মধ্যে ধরে রাখতেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তিনি আগুনের উত্তাপ অনুভব করতেন; অতঃপর তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে হুনায়েফ! অমুক দিন তুমি যে কাজ করেছ, তা করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? অমুক দিন তুমি যে কাজ করেছ, তা করতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করেছে?[7]

৭. বর্ণিত আছে: জনৈক সৎব্যক্তি যোদ্ধা ছিলেন; এক মহিলা তার উদ্দেশ্যে নগ্ন হয়ে গেল; তারপর তিনি তার দিকে তাকালেন; অতঃপর তিনি তাঁর হাত উঠায়ে তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন এবং তাঁর চোখ উপড়িয়ে ফেললেন; আর বললেন: নিশ্চয়ই তুমি তা দেখতে পাচ্ছ, সে যে ক্ষতি তোমার করেছে![8]

৮. কোনো এক ভালো মানুষ একটি কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বললেন: এ কক্ষটি কখন বানানো হয়েছে? অতঃপর তিনি আত্মসমালোচনায় মনোযোগ দিলেন এবং বললেন: তুমি আমাকে এমন এক প্রশ্ন করলে, যা তোমার কোনো প্রয়োজন ছিল না; আমি তোমাকে শাস্তি দিব এক বছর সাওম পালন করার মাধ্যমে, তারপর তিনি এক বছর সাওম পালন করলেন।[9]

৯. আরও বর্ণিত আছে: কোনো এক সৎ মানুষ উত্তপ্ত ভূমির দিকে গেলেন, অতঃপর তিনি তাতে গড়াগড়ি দিতে থাকলেন এবং নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন: মজা ভোগ কর, জাহান্নামের আগুন আরও অনেক বেশি উত্তপ্ত; তুমি কি রাতের বেলায় নোংরা বা পঙ্কিল এবং দিনের বেলায় বীর?[10]

১০. আরও বর্ণিত আছে: সৎ ব্যক্তিগণের কোনো একজন একদিন ছাদের দিকে তাঁর মাথা উঠালেন এবং এক নারীকে দেখলেন; তারপর তিনি তার দিকে তাকালেন; অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি যতদিন জীবনে বেঁচে থাকবেন কোনো দিন আকাশের দিকে তাকাবেন না।[11]

এভাবেই এ উম্মতের সৎকর্মশীল বান্দাগণ নিজেদের অবহেলার ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করতেন, ভুলত্রুটির জন্য নিজেকে নিজে তিরস্কার করতেন, নিজের 'নাফস'-এর জন্য তাকওয়ার বিষয়টিকে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য বিষয় বলে ধারণ করতেন এবং তাকে নিজের খেয়াল-খুশি মত চলা থেকে বিরত রাখতেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ "আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।"[12]

>

[1] সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৮

[2] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১

[3] মুসলিম, হাদিস নং- ৭০৩৩

[4] আর এই অর্থে ইমাম তিরমিযী রহ. 'হাসান' সনদে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

« الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنِ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ » .

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে; আর দুর্বল ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছেও আশা-আকাঙ্খা রাখে।" –(হাদিস নং- ২৪৫৯)।

[5] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২১

[6] বর্ণনাটি সহীহ হাদিসে বর্ণিত (উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২১)।

[7] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২১

[8] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[9] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[10] প্রাগুক্ত

[11] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

[12] সূরা আন-নাযি‘আত, আয়াত: ৪০ - ৪১

(ঘ) মুজাহাদা (المجاهدة):

আর ‘মুজাহাদা’ হলো মুসলিম ব্যক্তি জেনে রাখবে যে, তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তার ‘নাফস’, যা স্বভাবতই খারাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট, ভালো কাজ থেকে পলায়নমান এবং মন্দ কাজের উস্কানিদাতা বা নির্দেশদাতা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ

“আর আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, কেননা, নিশ্চয় মানুষের নাফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়েই থাকে।”[1] আর এ ‘নাফস’ পছন্দ করে শান্তিতে ও স্থায়ীভাবে আরামে থাকেতে, ভালোবাসে অবসর সময় কাটাতে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে সমূলে তাৎক্ষণিক বা নগদ ভোগবিলাসে আকৃষ্ট করতে, যদিও তাতে তার মরণ ও দুর্ভাগ্য বা দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি নিহিত রয়েছে।

সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি যখন এ বিষয়টি বুঝতে পারবে, তখন সে নিজেকে প্রস্তুত করবে তার ‘নাফস’কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ও সাধনা করার জন্য; ফলে সে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, অস্ত্রধারণ করবে তার বিপক্ষে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার বুদ্ধিহীনতা বা অস্থিরচিত্ততা এবং লোভ লালসাসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ফলে তার ‘নাফস’ যখন শান্তি পছন্দ করবে, তখন সে তাকে তার সুযোগ করে দিবে। আর যখন লোভ লালসার প্রতি আগ্রহী হবে, তখন সে তার জন্য তা হারাম করে দিবে; আর যখন কোনো আনুগত্য বা ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে বা বিরত থাকবে, তখন

তাকে শাস্তি দিবে এবং তিরস্কার করবে, তারপর যে (ভালো) কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা করতে তাকে বাধ্য করবে এবং যা কাজা বা বর্জন করেছে, তার কাযা আদায় করতে বাধ্য করবে। সে তার জন্য এ পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তার মন প্রশান্তি লাভ করবে ও পবিত্রতা অনুভব করবে; আর এটাই স্বীয় 'নাফস'-এর জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা ও সাধনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।"[2]

আর মুসলিম ব্যক্তি যখন আল্লাহর জন্য তার 'নাফস'কে প্রস্তুত করবে, যাতে তা পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হয় এবং হয় আল্লাহ তা'আলার করুণা ও সন্তুষ্টির অধিকারী, তখন সে বুঝতে পারবে যে, এটাই হলো সৎকর্মশীল ও সত্যিকার মুমিনগণের পথ; ফলে সে তাদের অনুসরণ করে পথ চলবে এবং পরিভ্রমণ করবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত জেগে নফল সালাত আদায় করতেন, এমনকি তাতে তাঁর দুই কদম মুবারক ফুলে পেটে যেত এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন:

« أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً » . (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ).

"আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াটাকে পছন্দ করব না?"[3] আর আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

« والله ، لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم كانوا يصبحون شعثاً غبراً صُفراً قد باتوا لله سجداً وقياماً ، يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم و جباههم ، و كانوا إذا ذُكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح ، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم . »

"আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণকে দেখেছি এবং আমি তাঁদের মত কোনো সৃষ্টিকে দেখিনি— তাঁদের সকাল হতো আউলা কেশে ধূলা মাখানো বেশে ফ্যকাশে চেহারায়, তাঁরা রাতযাপন করেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায়; তাঁরা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন পালাক্রমে তাঁদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ও কপাল মাটিতে রেখে সিজদারত অবস্থায়; আর তাঁদের যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তখন তাঁরা এমনভাবে আন্দোলিত হয়, যেমনিভাবে

ঝড়ের দিনে গাছপালা আন্দোলিত হয় এবং তাঁদের চোখের অশ্রুতে ভেসে তাঁদের কাপড়সমূহ ভিজে যেত।”[4]
আর আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: “যদি তিনটি জিনিস না থাকত, তাহলে আমি একদিনও বেঁচে থাকাটাকে পছন্দ করতাম না: ১. প্রচণ্ড তাপের সময় আল্লাহর জন্য তৃষ্ণার্ত থাকা (অর্থাৎ সাওম পালন করা), ২. মধ্য রাতে আল্লাহকে সিজদা করা, এবং ৩. এমন সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করা, যারা এমনভাবে বাছাই করে ভালো ভালো কথা বলে, যেমনিভাবে (খাওয়ার সময়) ভালো ভালো ফলগুলো বাছাই করা হয়।”[5]
আর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জামায়াতে আসরের সালাত আদায় করতে না পারার কারণে নিজেকে নিজে তিরস্কার করেন এবং এ কারণে তিনি দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের জমি সাদকা করে দেন।[6]
আর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন কোনো সালাত জামায়াতে আদায় করতে ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি ঐ রাতের পুরোটাই জেগে থাকতেন এবং পরের দিন মাগরিবের সালাত আদায় করা পর্যন্ত দিনের বেলায়ও ঘুমাতেন না, এমনকি রাতের আকাশে তারা উদয় হওয়ার পর তিনি দু’টি গোলাম আযাদ করে দিতেন।[7] আর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন:
« رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى ، وما هم بمرضى »
“আল্লাহ ঐসব সম্প্রদায়ের প্রতি রহম করুন, জনগণ যাদেরকে অসুস্থ মনে করে, অথচ তারা অসুস্থ নন।”[8] আর এগুলো হলো স্বীয় নাফসের উন্নয়নে কঠোর সাধনার কিছু নমুনা।
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ » . (رواه الترمذي).

“সেই ব্যক্তি উত্তম, যার বয়স দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং কাজ সুন্দর।”[9] আর উয়াইস আল-কারনী রহ. বলতেন:

« هذه ليلة الركوع فيحيى الليل كله في ركعة ، وإذا كانت الليلة الآتية قال : هذه ليلة السجود فيحيى الليل كله في سجدة » .

“এটা হলো রুকূ‘ করার রাত, ফলে তিনি এক রুকূ‘তে গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন; আর যখন পরবর্তী রাত আসত, তখন তিনি বলতেন: এটা হলো সিজদা করার রাত, ফলে তিনি এক সিজদাতেই গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন।”[10]
আর সাবিত আল-বানানী রহ. বলেন: আমি এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে পেয়েছি, যাদের একজন সালাত আদায় করতেন, অথচ তিনি হামাগুড়ি দেয়া ছাড়া তাঁর নিজ বিছানায় আসতে পারতেন না। আবার তাদের একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, এমনকি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার দুই পা ফুলে যেত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তার চেষ্টা-সাধনা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, যদি তাকে বলা হত: আগামী কাল কিয়ামত, তবুও তিনি অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার চিন্তা করতেন না। আবার তাদের কেউ কেউ যখন শীতকাল আসত, তখন তিনি ঘরের ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাতে তার ঘুম না আসে; আবার যখন গরমকাল আসত, তখন তিনি ঘরের ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে গরমের কারণে তার ঘুম না আসে। আবার কেউ কেউ সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেন।[11]

আর মসরূক রহ. এর স্ত্রী বলেন: “সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মাসরূক রহ.কে তাঁর দুই পা ফুলা অবস্থায় দেখা যেত; আল্লাহর কসম! আমি যদি তাঁর সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর পেছনে বসতাম, তাহলে তাঁর প্রতি সহমর্মিতার কারণে আমি কেঁদে ফেলতাম।”[12]
আর তাদের কারো বয়স যখন চল্লিশে উপনিত হত, তখন তিনি তার বিছানা গুটিয়ে ফেলতেন, তারপর তিনি তার উপর আর কখনও ঘুমাতেন না।[13]
আরও বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সৎব্যক্তিগণের মধ্য থেকে কোনো এক পবিত্রা নারী, যাকে অক্ষম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হত, তিনি যখন রাতের শেষ ভাগে উপনীত হতেন, তখন তিনি করুণ স্বরে ডাকতেন:

« إليك قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك ، وفضل مغفرتك ، فبك يا إلهى أسألك لا بغيرك أن تجعلنى في أول زمرة السابقين ، وأن ترفعنى لديك في عليين ، في درجة المقربين ، وان تلحقنى بعبادك الصالحين ، فأنت أرحم الرحماء ، وأعظم العظماء ، وأكرم الكرماء ، يا كريم ! » .

“হে আমার প্রভু! রাতের অন্ধকারে বান্দাগণ সবকিছু বয়কট করে তোমার দিকে আসে, তারা তোমার রহমত ও ক্ষমার দিকে দৌড়ায়; আতএব, হে আমার আল্লাহ! আমি তুমি ভিন্ন অন্য কারও কাছে নয়, শুধু তোমার কাছে আবেদন করছি যে, তুমি আমাকে অগ্রগামীদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, আমাকে তোমার নিকট-‘ইল্লীনে উঠায়ে নাও, আমাকে তোমার নিকটতম বান্দাগণের মর্যাদায় উন্নীত কর এবং আমাকে তোমার সৎ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর; কেননা, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান, মহামহীয়ান, সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল, হে মহনুভব!।”[14] অতঃপর সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং ফযর পর্যন্ত দো‘য়া ও ক্রন্দন করতে থাকে।[15]

>

তথ্যসূত্র

[1] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩

[2] সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৯

[3] বুখারী, হাদিস নং- ৪৫৫৭; মুসলিম, হাদিস নং- ৭৩০২

[4] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২৩

[5] প্রাগুক্ত

[6] প্রাগুক্ত

[7] প্রাগুক্ত

[8] আল-গাযালী রহ. তাঁর ‘এহইয়াউ ‘উলুমিদ্ দীন’, গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘মারফু’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৮)।

[9] তিরমিযী, হাদিস নং- ২৩২৯

[10] আল-গাযালী রহ., ‘এহইয়াউ ‘উলুমিদ্ দীন’ , ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩

[11] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২৪

[12] প্রাগুক্ত

[13] প্রাগুক্ত

[14] আল-গাযালী রহ., 'এহইয়াউ 'উলুমিদ্ দীন' , ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৪

[15] উদ্ধৃত, আবূ বকর আল-জাযায়েরী, মিনহাজুল মুসলিম, পৃ. ১২৪

References:

1. Al kawsar monthly magazine
2. Dhaka post daily news
3. At tahrik monthly magazine
4. Post from mowlana monowar hossain
5. Daily kaler kantho newspaper
6. Daily inqilab newspaper
7. www.islamofquran.com